পরজীবী প্রাণীর কথা

রেজাউর রহমান

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা : সুন্দরে অসুন্দরের কালো ছায়া ❑ ৭
দ্বিতীয় অধ্যায়
পরজীবিতার ধরন ও প্রকরণ ❑ ১৩
তৃতীয় অধ্যায়
এককোষী পরজীবী প্রাণী : প্রোটোজোয়া ❑ ১৬
চতুর্থ অধ্যায়
হেলমিনথ্‌স : পরজীবীর এক বিস্তৃত জগৎ ❑ ২৬
পঞ্চম অধ্যায়
আর্থ্রোপোডা : ভুবনবিজয়ী সর্ববৃহৎ প্রাণিগোষ্ঠী ❑ ৪৫
ষষ্ঠ অধ্যায়
পরজীবীর উৎস, অভিযোজন ও বিবর্তনধারা ❑ ৭৩

সুন্দরে অসুন্দরের কালোছায়া

পৃথিবী সুন্দর। এই সৌন্দর্যের শেষ নেই। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক এ জনম স্বার্থক। ঘরে আছে নানা সখ-সুখের আয়োজন। আরাম-আয়েশের অফুরান ভাণ্ডার। বাইরেও কি এর কমতি আছে? সুন্দর ঘরবাড়ি, বাগান, রাস্তাঘাট, সড়ক, জনপদ। নগর-বন্দর, হাট-ঘাট-বাজার — সবই মানুষ তৈরি করে নিয়েছে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য। এরপরও রয়েছে উপভোগের অঢেল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সবুজ সমতল ভূমি, আঁকাবাঁকা বয়ে যাওয়া নদী। গাছগাছালি, শাল-গজারির বন। উদাসীন পাহাড়। দীগন্তরেখায় ধূসর পর্বতমালা। বিশাল সাগর। সীমাহীন সমুদ্দুর। এসবের মাঝখানে আমাদের অস্তিত্ব যৎসামান্য হলেও আমরা নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে উঠি। পরিতৃপ্ত হয়ে থাকতে চাই। কিন্তু সবার জীবনেই আবার সময় সময় দেখা দেয় বিপর্যয়। বিপদের ঘনঘটা। একেক সময় একেক রকমের রোগ-বালাই, জরা-বার্ধক্য — এমনকি মৃত্যু আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আগলে দাঁড়ায় পথ। নির্মম সত্যের মতো। তখন আমরা থমকে দাঁড়াই। চিন্তিত হই। কেন এমনটা হয়? কেন এমনটা হল?

রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু এসবের বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ খুঁজতে গেলেও এক সমস্যা। এসবের কারণ যে একটি নয়— একাধিক। বরং অনেক বলাই ভাল। কেননা, এসবের সব খবর যে বিজ্ঞানী-চিকিৎকদেরও জানা নেই। তবে জানা নেই বলে-তো কৌতূহলী মন বসে থাকবে না। সে জানার চেষ্টা করবে। চেষ্টা করতে করতে কিছু সে জানবে; কিছু তার অজানা থেকে যাবে। সেই অজানাটুকু আবার বিজ্ঞানের জগতের এক চালিকা-শক্তি। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে দিশার আলোও বলা যায়। সত্যিকার অর্থে জ্ঞানীজনের কাছে — অন্ধকার বলে কিছু নেই বোধ করি। কোথাও না কোথাও সেই সাধক গুণীজনের চোখের সামনে সেই 'মঙ্গল দীপ' জ্বলছে। সে সেই দিকে এগিয়ে যাবেই। কারো বলা কওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবে না।

আমাদের জানা মতে, রোগ-জরা-মৃত্যুর যে সকল কারণ রয়েছে — এরমধ্যে 'পরজীবী' প্রাণী একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

Banglainternet.com

'পরজীবী'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'প্যারাসাইট'। যাকে ভেঙ্গে দাঁড় করালে দাঁড়ায় 'প্যারা' ও 'সাইটস'। এ শব্দগুলো মূলত গ্রীক। 'প্যারা'— শব্দের পরিভাষা 'ব্যতীত' এবং 'সাইটস'-এর অর্থ 'খাবার'। অর্থাৎ খাবার বা 'খাদ্য ব্যতীরেকে'। এতে

সহজভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, খাবার ছাড়া প্রাণী। কিন্তু আমরা সাধারণভাবে জানি, খাবার ছাড়া প্রাণী বাঁচতে পারে না। এখানে একটা ভুল বুঝাবুঝির জন্ম নিল নিঃসন্দেহে। — তা হলে কি পরজীবী প্রাণিগোষ্ঠী বলে এমন কোন দল রয়েছে, যারা খাবার বা পানীয় ছাড়াই বাঁচে। তা ঠিক নয়। জীবন বা প্রাণের ধর্ম যেখানে বিদ্যমান, সেখানে জীবের খাদ্যগ্রহণ একটা পূর্বশর্ত। জীবনের গুণাগুণ সম্পন্ন করতে হলে তাকে খাবার খেতে হবে। তা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ — যেভাবেই হোক না কেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পরজীবী প্রাণীও খাবে, তবে এর ধরন-পদ্ধতি ভিন্ন।

তা হলে 'পরজীবী' শব্দটি আর একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। 'পরজীবী'র সাধারণ অর্থকরণে দাঁড়াবে — 'পরের জীবিকায় যে চলে বা জীবিকা নির্বাহ করে। তা হলে নিশ্চয়ই পরজীবী জীবিকা সম্মানজনক নয়। তা মোটামুটিভাবে ঘৃণ্যই বলা চলে।

এবার আমরা নিজেদের দিকে একটু ফিরে তাকাই। আমরা কি মুক্তজীবী না পরজীবী? এখন আমি যদি বলি — আমরা অর্থাৎ এই পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যপ্রজাতি পরজীবী। সবার আতকে ওঠবারই কথা। এটা কেমন করে হয়? আমরা যে সৃষ্টির সেরা। আমরা পরজীবী! এ যে সম্মানজনক উক্তি নয়। পরগাছা/পরজীবী যে মোটামুটি একটা গালি।

আমরা আপাতদৃষ্টে স্বাধীন ও মুক্তজীবী। নিজের পায়ে ভর করে হাঁটি। নিজের খাদ্য নিজেরা জোগাড় করি। ভেবে-চিন্তে সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যে শোভনভাবে বসবাস করি। তা হলে আমরা পরজীবী হলাম কেমন করে?

ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা যাক। আমরা আসলে এক অর্থে 'পরজীবী'। কারণ, আমরা নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারি না। আমাদের প্রয়োজনীয় শর্করা (ধান, গম, যব, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি) আসে খেত-খামারের গাছগাছালি থেকে। আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ মূলত আসে মাছ, পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ারের উৎস থেকে। অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনধারণের জন্য জীবজগতের নানা উৎসের ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে গাছগাছালির অবস্থাটা কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানজনক। উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজের মধ্যেই তৈরি করে নিতে পারে অতি সহজে। গাছ সূর্যের আলো, জল ও মাটি থেকে এর যাবতীয় প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে। এবং সালোক-সংশ্লেষণ বা ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় তা গুছিয়ে নেয়। এই দিক দিয়ে প্রাণীর অবস্থাটা উদ্ভিদের চেয়ে নাজুক। সেই নাজুক প্রাণিগোষ্ঠীর সদস্য-তো আমরাও। আর খাদ্য তৈরির ব্যাপারে স্বনির্ভর নই। বরং পরমুখাপেক্ষী। তা হলে, আমরা যদি নিজেদের পরজীবী প্রাণী বলি তবে কি খুব একটা অন্যায় হবে?

BanglaInternet.com

সার্বিকভাবে মানুষকে পরজীবী প্রাণী বলে চিহ্নিত করায় একটা নীতিগত প্রশ্ন এসে যায়। পরজীবী কথাটা খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই সূত্রে আবার মানুষকে একটু ভিন্নদৃষ্টিতে দেখা দরকার। মানুষ উদ্ভিদ বা অন্যান্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল

হলেও এই উন্নত প্রাণীটির একটা হিসাব-নিকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে। আয়-ব্যয় বুঝে আমরা যা করার করি। এর যে ব্যতিক্রম নাই বা ব্যতিক্রম হবে না তেমন নয়। ব্যাতিক্রম সব সময়ই থাকবে।

অন্যান্য পরজীবী প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সূত্রগত তফাৎটি হলঃ মানুষ রেখে-ঢেকে ও ফলিয়ে খায়। যেমন, আমরা ধান-গমের গাছ ধ্বংস করে চাল-আটা-ময়দা পাই। কিন্তু এর পাশাপাশি আগামী ফসল ওঠানোর জন্য বীজও রেখে দেই। খেতের উর্বরা শক্তি, অধিক ফলনের প্রতিও নজর রাখি। কিংবা হাঁস-মুরগি, মাছ, গবাদিপশু ইত্যাদি আমরা নিধন করি ঠিকই — আবার তা প্রতিপালন ও সংরক্ষণের জ্ঞানটাও আমাদের রয়েছে টনটনে। অর্থাৎ একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসবের উৎপাদনও আমরা করে থাকি। সেদিক থেকে পরজীবিতার অসম্মানজনক নামকরণ থেকে আমরা মোটামুটিভাবে মুক্তি পেতে পারি। এবং তা পাওয়া উচিতও।

যে কোন বিষয়েরই আজকাল একটা ব্যাপকতা রয়েছে। সেই কারণে বিষয়গুলোকে বর্তমান সময়ে নানা শাখা-প্রশাখায় ভাগ এবং সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। পরজীবীবিদ্যা বিষয়টিও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে পরজীবীবিদ্যা বা তত্ত্ব বিষয়টি আমরা সাধারণত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর আঙ্গিকে বিবেচনা করে থাকি — যা প্রধানত আমাদের জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। সে সকল নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে অণুজীব, এককোষী প্রাণী, ওয়ার্ম বা হেলমিনথিস, কীটপতঙ্গ, মাকড়সা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এখানে একটা সঙ্গত প্রশ্ন হতে পারে, বড় বড় প্রাণী যেগুলো একে অপরকে সরাসরি ধরে খায় — সেগুলো কি পরজীবী নয়? যেমন, বাঘ হরিণ ধরে খায়। মানুষের মতো এদের হিসাব বা মাত্রাজ্ঞানও নেই— তা হলে বাঘ কেন পরজীবী হবে না? একদিক দিয়ে তা সত্য হলেও এসব ক্ষেত্রে আমরা আর একটা লাগসই শব্দ ব্যবহার করে থাকি। তা 'পরভোজী' বা 'প্রিডেটর'। পরভোজী স্বভাব ছোট ছোট প্রাণীতেও প্রচুর রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থনায় আমরা পরজীবী, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর পরজীবী প্রাণীতে সীমাবদ্ধ থাকব। এগুলোর সঙ্গে জনস্বাস্থ্য, খাদ্য উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় সঙ্গত কারণেই এই সীমারেখা টানা।

এখনকার সময়ে পরজীবীবিদ্যা একটা বিরাট ও জটিল বিষয়। এর বিস্তৃতি বা কলেবর নির্ধারণও সহজ নয়। এই পরিস্থিতিতে আমরা এ বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে পরজীবী প্রাণীর সীমারেখা চিত্রিত করার চেষ্টা করব। বিষয়টির পুরো অঙ্গিকে নয়। পুরো আঙ্গিকে যেতে গেলে চিকিৎসাবিদ্যা ও অনুজীববিদ্যার জটিলতা বিষয়টিকে সাধারণের বুঝার নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে হতে পারে। এই কারণে, আমরা এখানে মূলত পরজীবী প্রাণীর পরিচয়, জীবন-চক্র, সংরক্ষণ, ক্ষতিকর দিক — এমনকি এগুলো থেকে রেহাই পাওয়ার কিছু কিছু প্রারম্ভিক দিক আলোচনা করব। তাই অণুজীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার দিকটি সজ্ঞানে পাশ

banglainternet.com

কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

পরজীবী সংক্রান্ত ইতিহাস যদি আমরা একটু ঘেটে দেখি, তবে দেখা যাবে, যুগে যুগে পরজীবী প্রাণীর আক্রমণ ও সহায়তায় বহুবার মানব সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েছে। সেইসব ভয়াবহ মহামারির কথা কমবেশি আমাদের অনেকেরই জানা আছে। যেমন, এদেশে কলেরা-বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর লক্ষ-কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। একইভাবে প্লেগ মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিপুল প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বদৌলতে সেসব ভয়াবহ রোগ-শোক থেকে আমরা মোটামুটি রেহাই পেয়েছি। 'মোটামুটি' কথাটা ব্যবহার করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। সেই রোগ সৃষ্টিকারী সংক্রামক জীবাণু ও বাহক/পোষক উৎসগুলো কিন্তু আমরা এখনো প্রকৃতি থেকে সমূলে বিনষ্ট করতে পারিনি। বিশেষ করে, আমাদের মতো বিজ্ঞানবর্জিত দেশে আমরা সবসময় সজাগ না থাকলে সেগুলো আবার যে কোন সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ঘটাবে অগণিত প্রাণহানি।

কলেরা-বসন্ত, প্লেগ ছাড়াও পরজীবী প্রাণী দ্বারা যে সকল সংক্রমণ ও রোগে মানুষ সচরাচর আক্রান্ত হয়ে থাকে তার মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পীতজ্বর, ডেঙ্গু, টাইফয়েড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলোও যুগেযুগে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

হুকওয়ার্ম, পিনওয়ার্ম, অ্যাসকেরিস, ফিতাকৃমি, 'ফেসিওলা', 'ফিলারিয়াই', 'ওনকোসেরা', 'সিস্টোসোম', 'ট্রাইপেনোসোম', 'ল্যাসমেনিয়া' ইত্যাদি পরজীবী প্রাণীগুলোর সংক্রমণ আমাদের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। নানা ধরনের রোগ, যেমন, পেটের পীড়া থেকে শুরু করে অন্ধত্ব এসবের সংক্রমণের দ্বারা হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের এক হিসাবে দেখা গেছে, সারাবিশ্বে বাইশ কোটি লোক কেবল হেলমিনথিস পরজীবী প্রাণী দ্বারা সংক্রমিত। এই ধরনের বিশ্বজোড়া পরিসংখ্যানগুলোর গুরুত্ব আমাদের জন্য খুব একটা লাগসই নয়। আমাদের অবস্থা আরও করুণ। কেননা, বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত চেতনার দিক দিয়ে আমরা জাতি বা দেশ হিসেবে মানগত জরিপে প্রায় সবার নিচে অবস্থান করি। আমাদের জীবিকা ও জীবন-যাপনের অবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের— যার প্রধান কারণ দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও কুসংস্কার এই দুরবস্থায় আরো ইন্ধন জুগিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের পানীয় জলের অবস্থাটাই ধরা যাক। আমাদের খুব সীমিতসংখ্যক শহর-বন্দর বাদ দিলে কোন এলাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে বিশুদ্ধ পেয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। শহরে যা আছে তাও আমরা যারা নিজেদেরকে সামান্য স্বাস্থ্য সচেতন বলে দাবী করি— তারা এটাকে বিশুদ্ধ বলি না। সেই টেপের পানিও আবার আমরা ফুটিয়ে খাই। সেই ফুটানো পানি নিয়ে পথেঘাটে চলাফেরা করি। পারতপক্ষে আমরা বাইরের পানি খাই না। এমন অবস্থায় আমরা আটষট্টি হাজার গ্রাম

banglainternet.com

ও গ্রামের মানুষের অবস্থাটা কি একটু ভেবে দেখেছি? সেসব জায়গার কোথাও দু' একটি অবস্থাপন্ন বাড়িতে গভীর নলকূপ থাকতে পারে। আবার নাও থাকতে পারে। থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তাতে কিছু যায়-আসে না। কারণ, সর্বসাধারণের সেই সুযোগ গ্রহণের মতো অবস্থা নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের একমাত্র ভরসাস্থল কাঁচা কুয়া, খাল, বিল-ঝিল, নদীনালার পানি। সেই পানি যে কত খারাপ এর এক ফোটা আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ফেলে দেখলেই টের পেয়ে যাব। তাতে অবশ্যই থাকবে অসংখ্য চেনা-অচেনা পরজীবী প্রাণী। এই সূত্রে আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। আমাদের পয়ঃপ্রণালী বিধান খুব খারাপ। শহরের ধনীবিত্ত পরিবেশ বাদ দিলে নির্ধারিত পায়খানা প্রথা নাই বললেই চলে। গ্রামে-তো অবশ্যই নাই। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পুরো দেশটাই একটা খোলা পায়খানা।

পরজীবী সংক্রমণের অন্যান্য পদ্ধতি-প্রথার কথা বাদ দিয়ে শুধু যদি আমরা ওপরের দুটি' অব্যবস্থার কথাই ধরি— তা হলেও-তো আমার ধারণা এই সমগ্র জাতি পরজীবী প্রাণীর সংক্রমণে আক্রান্ত। কেননা, আমার বিশ্বাস— কৃমির সংস্পর্শ থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। কম-বেশি সবাই আক্রান্ত। অর্থাৎ আমরা সবাই কোন না কোন পরজীবী প্রাণীর পোষক এবং তা আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। অনেক সময় তা মারাত্মক আকারও ধারণ করছে নিঃসন্দেহে। এটাকে যদি মোটামুটি সত্য বলে ধরে নেই তবে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে গৃহপালিত প্রাণী যথা, হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। এগুলোও সব রুগ্ন। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রাণীগুলো পরজীবী সংক্রামক প্রাণীর মধ্য-পোষক বা ইন্টারমেডিয়েট হোস্ট। ফলে আমরা আমাদের প্রাণীজ আমিষ পরিমাণে যথেষ্ট কম পাই। সেই অল্প উৎপাদনের সঙ্গেও আমাদের জনস্বাস্থ্যের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

এই সংক্রমণগুলো আপাতত তেমন মারাত্মক না হলেও জনগোষ্ঠীকে করে তোলে নির্জীব ও কর্মবিমুখ। হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু উৎপাদনের পরিমান যথেষ্ট হ্রাস পায়। সেই দিক দিয়ে এই বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ লুই পাস্তুরের (১৮৬৩) অণুজীবসূত্র আবিষ্কারের আগে মানুষের ধারণা ছিল দুধ, রস বা যে কোন কাঁচা দ্রব্য যে উৎসেচিত হয় বা পঁচে যায় তা প্রকৃতিতে এমনি এমনি ঘটে থাকে। এর সঙ্গে অণুজীবের সম্পর্ক ও এর জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা তখন জানা ছিল না একেবারেই। তেমনি অনেক সংক্রামক রোগ মানব দেহে আঁচিল, গুটি বা ফোড়ার মতো আপনা-আপনি হয় বলে সে সময়ের মানুষের ধারণা ছিল।

Banglainternet.com

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পরজীবী প্রাণী ও সামগ্রিকভাবে পরজীবীবিদ্যা বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বা বিজ্ঞানীদের জ্ঞান যথেষ্ট সীমিত ছিল। এই সীমিত জ্ঞানের আওতায় ছিল কিছু বহিঃপরজীবী (একটোপ্যারাসাইট),

যেমন, উকুন ও ফ্লী-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলোকে প্রথমত মানুষ এদের যন্ত্রনাদায়ক ও বিরক্তিকর কামড়ের জন্যই তখন শনাক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া কৃমি, ফিতাকৃমি, পিনওয়ার্ম, গিনীওয়ার্ম সম্পর্কেও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। তাও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সেগুলো তখন খুব একটা পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হয়ত-বা এ প্রাণীগুলো অন্তঃপরজীবী (অ্যাভোপ্যারাসাইট)। সাধারণত এগুলো প্রাণী ও মানুষের দেহের অভ্যন্তরে বসবাস করে বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা লোকচক্ষু এড়িয়ে যেত। এগুলোর স্বাস্থ্যহানিকর দিকের কথা-তো আরও অজানা ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এ বিষয়টি এমনি একটা অখ্যাত ও নড়বড়ে অবস্থার মধ্যে ছিল। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিভ্যানহুকের অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কিছু বিজ্ঞানী এককোষী প্রাণী দেখতে সক্ষম হন। কাছাকাছি সময়ে ফ্রান্সিস্কো রেড়ি মাছির ডিম থেকে যে ম্যাগট/শূককীট হয় — তা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আজকের দিনে এই ঘটনাগুলো অতি সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সময়ের জন্য সেসব ছিল অসাধারণ সব পর্যবেক্ষণ। এক অর্থে যুগান্তকারীও বটে। কেননা, পরবর্তীকালে এ সামান্য ঘটনাগুলো ঘিরেই বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার হয়েছে। মূল্যবান তথ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের হয়েছে অশেষ অগ্রগতি। এই সব সত্য-সন্ধানে মানব জীবনে নিরাপত্তা এসেছে। এসেছে সমৃদ্ধি।

ম্যালমস্টেন (১৮৫৬) নামক একজন সুইস বিজ্ঞানী প্রথম মানুষের পরজীবী এককোষী প্রাণী 'ব্যালেনটেডিয়াম কোলাই' আবিষ্কার করেন। সুইস প্রকৃতিবিদ লিনিয়াস তাঁর শ্রেণীবিন্যাস-চর্চায় বেশ কিছু পরজীবী প্রাণীর উল্লেখ করেছিলেন। জেডের ১৮০০ সনে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ওয়ার্মের কথা জানা ছিল, যা পরবর্তীকালে রুডল্‌ফি 'নেমাটয়িডিয়া', 'অ্যাকান্থসেফেলা', 'নেমাটোডা', 'সেসটোডা' ও 'সিস্‌টিকা' নামে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ের অন্যান্য অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, উপরোক্ত নামকরণগুলো আজো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ অসংখ্য চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী পরজীবী প্রাণীর ওপর প্রচুর কাজ করেন। এর মধ্যে মানুষের 'ট্রাইচিনেলা', 'হুকওয়ার্ম', 'অ্যামিবা', 'এন্টামোয়িবা' এবং ব্যাঙের রক্তে 'ট্রাইপ্যানোসোমা' পর্যবেক্ষণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে ধরে নেয়া হয়। কারণ, এগুলোর যথেষ্ট পরিমাণে অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত গুরুত্ব রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়টি প্রকৃতিবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের দেশেও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রম দেখলে এ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা খুব কঠিন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সকল পাঠ্য তালিকায় পরজীবীবিদ্যা পাঠ অপরিহার্য। আমাদের চতুষ্পার্শ্বের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকার কারণেই তা করতে হবে। পরজীবী প্রাণীদের জানতে হবে।

BanglaInternet.com

পরজীবিতার ধরন ও প্রকরণ

পরজীবী ও পরজীবিতা সূত্রের যে শব্দটি সহজে আমাদের কাছে এসে হাজির হয়— তা হল 'পোষক' বা 'হোষ্ট'। কেননা, একটি পরজীবী প্রাণীর জীবন-ধারণ, বংশবিস্তারের জন্য অন্য একটি প্রাণী বা জীবদেহের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে পরজীবী প্রাণী ও পোষকের মধ্যে যে যোগসূত্রটি গড়ে ওঠে তা প্রধানত দু'ধরনের— ইচ্ছাধীন পরজীবী বা ফ্যাকুলটেটিভ প্যারাসাইট ও বাধ্যতামূলক পরজীবী বা অবলিগ্যাটরি প্যারাসাইট।

ইচ্ছাধীন পরজীবী প্রাণীগুলো জীবন-চক্রের কিছুটা সময় সাধারণভাবে অতিবাহিত করে। আবার কিছুটা সময় পরজীবী জীবনও কাটায়। জীবন-চক্রের কোন একটা পর্যায়ে এমনটা ঘটে থাকে। এরও অভিযোজন ও বিবর্তনভিত্তিক কারণ রয়েছে। কিছু কিছু কীটপতঙ্গে এ ধরনের অবস্থা দেখা যায়। সমপর্যায়ের আর এক ধরনের পরজীবী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়— যাকে 'সবিরাম' পরজীবী বা ইন্টারমিটেন্ট প্যারাসাইট বলা হয়। সবিরাম পরজীবী প্রাণীগুলো নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে পোষক প্রাণীদেহের ওপর চড়াও হয়ে থাকে। এর অতিপরিচিত উদাহরণ হল মশা। মশা একবার ভরপেট খাওয়ার জন্য মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীতে নির্ভরশীল হয়। বাকী সময় এগুলো মুক্তজীবী। কিছু উকুন জীবন-চক্রে খোলস বদল বা নির্মোচন এবং ডিম দেয়ার সময় হলে পোষকের দেহ ছেড়ে চলে যায়। এ সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আবার পোষকের দেহে ফিরে আসে। কতগুলো আঠালি বা টিকস ডিম দেয়ার সময় যে পোষকের দেহ ছেড়ে যায় আর ফিরে আসে না।

অন্যদিকে আমাদের সাধারণ কৃমিজাতীয় এবং অন্ত্রীয় এককোষী পরজীবী প্রাণীগুলো ডিম দেয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত পোষকের দেহে থেকে যায়। অর্থাৎ কোনক্রমে এদের স্বাধীন জীবন-যাপন সম্ভব নয়। এগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবেই পোষকের দেহে এদের এই সম্পূর্ণ পরজীবী জীবন মেনে নিতে হয়। এর ব্যতিক্রম খুব একটা হয় না। ব্যতিক্রম হলে এগুলো এদের জীবননাশের মুখোমুখি হয়। তবে একটি পোষকের দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রমণের নানা ধরনের প্রকৃতিগত ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য এই সকল প্রাণীর পরজীবী জীবনযাপনের পুরোটাই যে পোষকের জন্য ক্ষতিকর তাও নয়। এদের জীবন-চক্রের কোন একটি খন্ডকাল মাত্র ক্ষতিকর। যেমন, বটমাছির জীবন-চক্রের শুককীট পর্যায়টি শুধুমাত্র পোষক দেহের জন্য ক্ষতিকর। এর বাকি পর্যায়গুলো পোষকের ওপর নির্ভরশীল নয়। অন্যদিকে আমাদের দেহে হুক-ওয়ার্মের যে সংক্রমণ হয় সেখানে এই পরজীবী প্রাণীটির পরিণত অবস্থাই

BanglaInternet.com

অবস্থাই আমাদের বেশি ক্ষতি করে থাকে। আমাদের দেহে এই প্রাণীগুলোর বংশবৃদ্ধি হতে থাকে এবং এগুলোর পরিণত জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় রসদ এ দেহ থেকে সংগ্রহ করে। অর্থাৎ আমাদের জীবনের উপার্জিত খাদ্যসারে এরা সরাসরি ভাগ বসায়।

পোষকের দেহে পরজীবী প্রাণীর অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এই সম্পর্কের আবার দু'টি প্রকারভেদ রয়েছে। বিভাগ দু'টি হচ্ছে, বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী। বহিঃ ও অন্তঃ এই শব্দ দু'টির সাধারণ অর্থ দিয়েই এই প্রকারভেদের মূলকথা আমরা বুঝে নিতে পারি। যেমন, বহিঃপরজীবী প্রাণী পোষকের দেহের বাইরে বসবাস করে। সেখানে থেকে এই জাতীয় প্রাণীগুলো পোষকের রক্ত, চুল, পালক, চামড়া বা চামড়া-নিঃসৃত রস থেকে এদের জীবনধারণের যাবতীয় রসদ সংগ্রহ করতে সচেষ্ট থাকে। বস্তুত এরা এভাবে সফলও। ছারপোকা ও উকুন এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যদিকে অন্তঃপরজীবী প্রাণী পোষক দেহের ভেতরে অর্থাৎ পরিপাকতন্ত্র বা দেহ-গহ্বরের অন্যান্য অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। এই অভ্যন্তরীন অংশগুলোর মধ্যে বিশেষ কোন অঙ্গ, রক্ত, কোষকলা— এমন কি কোষের ভেতরেও এদের বসবাস করতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর পরজীবী প্রাণীর মধ্যে নানা ধরনের কৃমি, হুকওয়ার্ম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমরা অনেকেই যে, এ সকল প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত এতে সন্দেহ নাই। তবে কিছু কিছু পরজীবী প্রাণী রয়েছে যেমন, কিছু ওয়ার্ম ও ক্ষুদ্র মাকড় (মাইট) কখনো ত্বকের ওপরে আবার প্রয়োজনে মুখ-গহ্বর, নাসারন্দ্র এমনকি ত্বক খুঁড়ে ভেতরে প্রবেশ করে বসবাস করে। তা সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদীও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বহিঃ বা অন্তঃ এ ধরনের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সহজ নয়।

পোষক-পরজীবী সম্পর্কিত আর একটা জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরজীবী প্রাণী সব সময় একই পোষক দেহে এদের জীবনের সকল পর্যায় অতিবাহিত করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তা দুই বা ততোধিক পোষকের মাধ্যমে এদের জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করে। কয়েকটি বিশেষ ধরনের ফ্লুকের বেলায় তা চারটিও হতে দেখা যায়। অর্থাৎ এর অপরিণত অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থায় যেতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় রয়েছে তা আলাদা আলাদা পোষক প্রাণীতে সম্পন্ন করে। এই ভিন্ন ভিন্ন পোষকের একটা শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। যেমন, যে পোষকের আশ্রয়ে পরজীবী প্রাণীগুলো প্রজননক্ষম হয়— তা 'নির্দিষ্ট পোষক'। অন্যদিকে ঐ পরজীবী প্রাণীটির অন্য পর্যায়গুলো যে সকল জীবদেহে বেড়ে ওঠে তাকে মাধ্যমিক পোষক বলা হয়। এই অবস্থার আদর্শ উদাহরণ হল— মশা। মশা ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী এককোষী প্রাণীর নির্দিষ্ট বাহক এবং আক্রান্ত মানুষ এর প্রধান পোষক।

পরজীবী ও পোষক প্রাণীর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। এই প্রকারভেদগুলোর মধ্যে পরস্পরজীবিতা (মিউচুয়ালিজম), ব্যতিহারজীবিতা (কমেনসালিজম), মিথোজীবিতা (সিমবায়োসিস), পরজীবীতে

BanglainternetCom

পরজীবী (হাইপার–প্যারাসাইটিজম) উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা থাকলে পরজীবীবিদ্যার ওপর আলোচনা সহজতর হবে।

পরস্পরজীবিতা সূত্রে পোষকের দেহে পরজীবীর উপস্থিতিতে পোষক উপকৃত হয়। তা যে পরজীবী প্রাণী ইচ্ছাকৃতভাবে করে যায় তাও নয়। পোষক দেহে পরজীবী প্রাণীর উপস্থিতি, এর জীবনধারণ, বংশবিস্তার ইত্যাদি নানাবিধ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে অজান্তে এটি উপকার করে যেতে থাকে। এই উপকার যে পোষকের জন্য সবসময় প্রয়োজন তাও নয়। সেই উপকার কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ। তবে সাধারণ নিয়মে একে অপরের কাছ থেকে ফায়দা নেয়। অর্থাৎ এদের জীবনের অনেক কার্যকলাপের জন্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং একে অপরের থেকে উপকার নিয়ে থাকে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের আবার কিছু বিভক্তি রয়েছে। যেমন, পোষকের দেহের অভ্যন্তরে বসবাস করেও যখন পরজীবী প্রাণীটি সেখান থেকে খাদ্যরস সংগ্রহ করে না তখন তাকে আত্মঃব্যতিহারজীবী বা ইনকুইলিনিজম বলা হয়। এই সূত্রে পরস্পরজীবিতা ও ব্যতিহারজীবিতা মোটামুটি একই ধরনের অর্থ বহন করে। ব্যতিহারজীবিতার ক্ষেত্রে পরজীবী প্রাণী পোষকের ক্ষতি করে না বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোষক জীবটি তা অগ্রাহ্য করে যায়। জীবজগতের এটি একটি সাধারণ নিয়ম। যতক্ষণ না কোন প্রাণীর স্বার্থহানি ঘটে, বা এর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে ততক্ষণ সেই প্রাণী নিজের মতোই থাকে। কোন অনিয়মেও যেতে চায় না।

মিথোজীবিতার বেলায়ও দু'টি আলাদা আলাদা জীবের সহাবস্থানকে বুঝায় এবং এ ক্ষেত্রেও পারস্পরিক উপকারিতা এর মূখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই সম্পর্ক দু'টি জীবের খাদ্যগ্রহণ, বংশবিস্তার, আত্মরক্ষা ও আশ্রয়ের প্রয়োজনে সংঘটিত হয়। তবে প্রয়োজনের তাগিদে এই সম্পর্কের সীমারেখা যে সব সময় সুনির্দিষ্ট থাকে তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সহনশীল সীমায় নাও থাকতে পারে।

জীবজগতে পরজীবী–পোষক সম্পর্কিত আর এক ধরনের সহাবস্থান রয়েছে। যাকে পরজীবীতে পরজীবী বা হাইপারপ্যারাসাইটিজম বলা হয়। এক্ষেত্রে একটি পোষকের ওপর প্রথম পরজীবী এবং প্রথম পরজীবীর ওপর আবার দ্বিতীয় পরজীবী এসে ভর করে। এই তিনে মিলে শিকলকৃত যে সহাবস্থান দেখায় এর মধ্যে এককোষী এন্টামোবা, ওপালিনী ও ব্যাঙজাতীয় প্রাণীর সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য।

পরজীবী–পোষক সম্পর্কের উল্লেখিত সূত্রগুলো যে সব ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে মিলে যাবে তা নয়। প্রকৃতিতে এর যথেষ্ট রকমফেরও দেখা যায়। এছাড়া বিজ্ঞানের যেকোন বিষয়ের মতো এটিও জীববিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গতিশীল শাখা। এর ওপর প্রচুর কাজ হচ্ছে। দিনকে দিন নতুন নতুন তথ্য এবং তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে। সেই আলোকে সূত্রগুলোর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হচ্ছে নানাভাবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে তা পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে।

BanglaInternet.com

এককোষী পরজীবী প্রাণী : প্রোটোজোয়া

পৃথিবীতে কোটি কোটি উদ্ভিদ-জাত রয়েছে। রয়েছে প্রাণীও। এই সকল কোটি কোটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকৃতি-প্রকৃতিগত মিল থাকলেও অমিল যথেষ্ট রয়েছে। যেমন, যে কোন পাখির আমাদের মতো পা আছে, পায়ের আঙ্গুল আছে, নখ আছে। অন্যদিকে সেগুলোর আমাদের মতো হাতও রয়েছে। শুধু তা দেখতে অন্যরকম। পাখায় আবৃত। আবার আমাদের হাত ও পাখির সামনের ডানার হাড় বা কঙ্কালটি যদি আমরা চোখের সামনে তুলে ধরি তবে দেখব যে, সেখানেও সুস্পষ্ট মিল রয়েছে। তাই বলে পাখি ও মানুষকে কেউ কি এক ভাবে? কখনোই না। পাখি এক দলের প্রাণী। মানুষ অন্য দলের। তেমনি কেঁচো, কীটপতঙ্গ, তারামাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, মাছ, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী— এগুলো সবই আলাদা আলাদা প্রাণিগোষ্ঠী। আকার— আঙ্গিক, স্বভাব-চরিত্র, বিচরণ-বিস্তৃতি— সবদিক দিয়ে এগুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর। তবে জীবের মৌলিক একক কিন্তু সব ক্ষেত্রে প্রায় এক রকমের। অর্থাৎ উদ্ভিদই হোক, আর প্রাণীই হোক — এসবই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। ছোট পোকামাকড় থেকে নিয়ে বিশালদেহী হাতি, তিমি— সবার দেহই বিপুল সংখ্যক কোষের যোগফল। এই কোষ সাধারণ চোখে দেখা যায় না। তা শুধুমাত্র শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় দেখতে হয়। এখানে সহজে ধরে নেয়া যায় যে, যে প্রাণী যত বড়— তার কোষের সংখ্যাও তত বেশি হওয়ার কথা।

কোষের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া। দ্বিতীয়টি বহুকোষী বা মেটাজোয়া। আমরা আমাদের চোখের সামনে সচরাচর যতসব প্রাণী দেখি— এর প্রায় সবই মেটাজোয়া। কারণ, এগুলো তুলনামূলকভাবে আকারে বড়। সবার চোখে পড়ে। অপরপক্ষে প্রোটোজোয়া আকারে এত ছোট যে, তা অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া দেখার প্রশ্ন ওঠে না। সেই কারণে এগুলো সাধারণের কাছে খুব পরিচিতও নয়। কিন্তু পরজীবিতার দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মারাত্মক। যেমন, জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি— ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, রক্তামাশয়, এই সামান্য এককোষী প্রাণীর সংক্রমণে হয়ে থাকে। পরিণামে তা অনেকের মৃত্যুর কারণ

BanglaInternet.com

হয়ে দাঁড়ায়।

প্রোটোজোয়ার দেহগঠন ও আঙ্গিক সহজতর। সাধারণভাবে এর দেহে কোষপ্রাণ বা সাইটোপ্লাজম এবং কমপক্ষে একটি কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস থাকে (চিত্র–১)।

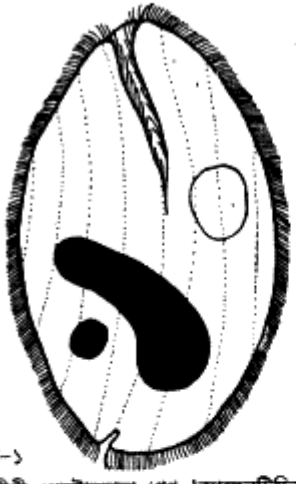

চিত্র–১
পরজীবী প্রোটোজোয়া (গণ–'ব্যালেন্টিডিয়াম')।

কোষপ্রাণ— বহিঃকোষপ্রাণ ও অন্তঃকোষপ্রাণে (অ্যাক্টোপ্লাজম ও অ্যান্ডোপ্লাজম) বিভক্ত— যাতে কিছুসংখ্যক অঙ্গাণু বা অর্গেন্যালি রয়েছে।

বহিঃকোষপ্রাণ এককোষী প্রাণীটির চলাচল, রেচন, শ্বাস–প্রশ্বাস, খাদ্যগ্রহণ ও প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে। আর অন্তঃকোষপ্রাণ–কেন্দ্রকের প্রধান কাজ— পুষ্টি ও প্রজননে অংশগ্রহণ করা। আমরা জানি যে, যেকোন জীবের কেন্দ্রক জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের বংশগতিক সংকেত বহন করে। এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না খুব একটা।

যে কোন প্রাণিগোষ্ঠী বা দলের প্রজাতির সংখ্যা নিরূপণের প্রচলিত নিয়ম রয়েছে এবং সেই জরিপ সুশৃঙ্খল এবং বিশ্ব জুড়েই হয়ে থাকে। প্রোটোজোয়া দলটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রীয় হলেও — এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রোটোপ্রানিবিদেরা এই দলের পরিচিত প্রজাতির সংখ্যা বর্ণনা করেছেন ১৫,০০০। তবে এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ দলের হাজার হাজার প্রজাতির খবর এখনো অজানা।

আলোচনার সুবিধার্থে পর্ব বা ফাইলাম প্রোটোজোয়াকে নিম্নলিখিত পাঁচটি দলে ভাগ করা যায়। এছাড়াও এই পর্ব–শ্রেণীবিন্যাসে অন্যান্য পদ্ধতিরও প্রচলন রয়েছে। শ্রেণীগুলো হচ্ছেঃ

ক) ফ্লাজেলেটা বা ম্যাস্টিগোফোরা (লম্বা ফ্ল্যাজেলাওয়ালা)

খ) অ্যামোয়বিডা বা রাইজোপোডা (ভ্রমপদসহ বা সুজোপোডিয়াসহ)

গ) সিলিওফোরা বা সিলিয়েট্স (ছোট সিলিয়াওয়ালা)

ঘ) স্পোরজোয়া বা টিলোস্পোরিডিয়া (চলনাঙ্গ নাই)

ঙ) নিডোস্পোরডিয়া বা নিয়োস্পোরিডিয়া (পোলার ক্যাপসুল–অঙ্গাণুসহ)

Banglainternet.com

উপরোক্ত পাঁচটি দলের মধ্যে আমাদের জনস্বাস্থ্য ও অপকারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্লাজেলেটা, অ্যামোয়বিডা ও স্পোরজোয়া বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা আমাদের আলোচনা এই সীমিতসংখ্যক দলেই সীমাবদ্ধ

রাখার চেষ্টা করব।

পরজীবী ফ্লাজেলেট প্রোটোজোয়াঃ এই এককোষী দলের প্রাণীগুলো সকল ধরনের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মুক্তজীবী প্রাণীগুলো ছাড়া ব্যতিহারজীবী ও পরজীবীগুলো বরফাবৃত পর্বতশৃঙ্গই হোক আর সাগরের তলদেশই হোক— সব জায়গায় বিস্তৃত। এই পরজীবীগুলো প্রায় সব প্রধান প্রধান প্রাণিদলে খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া এগুলো উদ্ভিদেও ছড়িয়ে আছে।

মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখি আক্রমণকারী সকল ফ্লাজেলেটকে দু'দলে ভাগ করা যায়। যেমন,

(ক) রক্তবহ বা হিমোফ্লাজেলেট ও

(খ) অন্ত্রীয় বা ইন্টেসটিনাল ফ্লাজেলেট।

হিমোফ্লাজেলেট পোষক মেরুদন্ডী প্রাণীর রক্ত, কোষকলা ও অন্যান্য অঙ্গে বিস্তার লাভ করে। তবে এদের জীবনচক্রের অন্তত একটি পর্যায়ে এগুলো কীটপতঙ্গের অন্ত্রে বসবাস করে। এই পরজীবী সদস্যগুলো 'ট্রাইপ্যানোসোমেডি' পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে 'ল্যাসমেনিয়া' ও 'ট্রাইপ্যানোসোমা' গণ দু'টি মানুষের পরজীবিতার দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিকর।

ল্যাসমেনিয়াঃ এই পরজীবী প্রোটোজোয়ার সংক্রমণ দু'ভাবে হতে দেখা যায়। তা আন্তর্যন্ত্রীয় ও ত্বকীয়। এই পরজীবীর প্রধান বাহক বা ভেক্টর বেলেমাছি বা স্যান্ডফ্লাই। যার জীবজ নাম, 'ফ্লেবটমাস' প্রজাতি। এই এককোষী প্রাণী রক্ত-মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিস্তার লাভ করে। এগুলো আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষকলা (যেমন, চামড়া, শ্লেষ্মা, প্লীহা, যকৃৎ, মেরুমজ্জা ইত্যাদি) আক্রমণ করে এবং সেখানটায় বংশবিস্তার করে।

ল্যাসমেনিয়া আকারে ছোট, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি বা মাকু আকারেরও হতে পারে (চিত্র–২)। এগুলোর সাধারণ ব্যাস ১.৫—৪ মাইক্রোমিটার। এরমধ্যে গোলাকার কেন্দ্রক রয়েছে এবং সহজ বিভক্তির মাধ্যমে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। পোষক কোষে ৫০—২০০ টি অংশে বিভক্ত হয়ে গেলে পরজীবী 'ল্যাসমেনিয়া' খন্ডগুলো আক্রান্ত কোষ ফেটে বের হয়ে যায় ও কাছাকাছি অন্যান্য দেহকোষকে আক্রমণ করে।

আন্তর্যন্ত্রীয় 'ল্যাসমেনিয়া' সংক্রমণের (ল্যাসমেনিয়াসিস) দ্বারা মানুষের যে সকল রোগ হয় এরমধ্যে কালাজ্বর সবচেয়ে মারাত্মক। কালাজ্বর একটি অভ্যন্তরীন সংক্রমণ এবং ধীরে ধীরে এর প্রকোপ বেড়ে যায়। এই পরজীবীর আক্রমণে রোগীর জ্বর ও সেই সঙ্গে প্লীহা এবং যকৃত বেড়ে যেতে দেখা যায়। কালাজ্বরের সংক্রামক

BanglaInternet.com

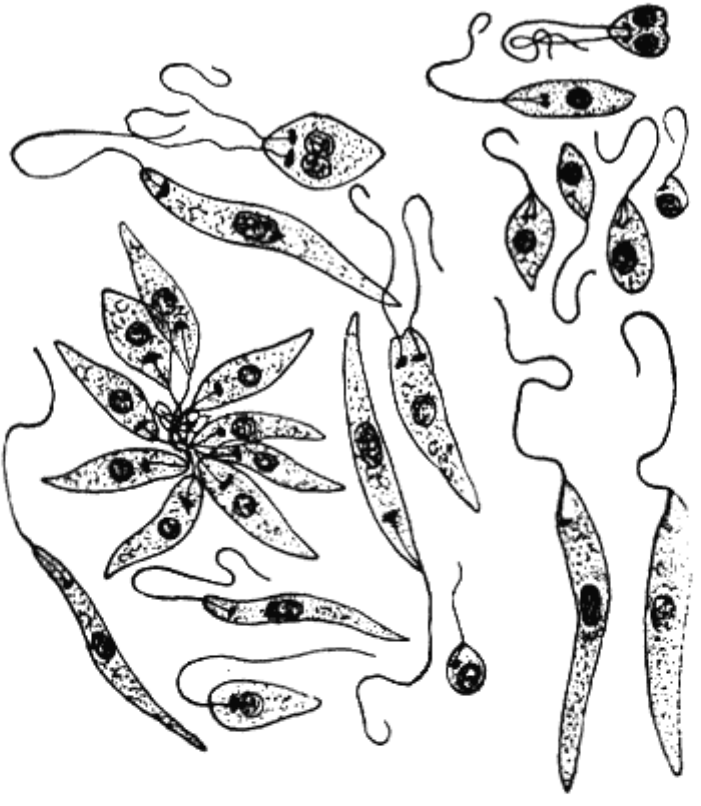

চিত্র-২ 'ল্যাসমেনিয়া' প্রজাতির আকার-প্রকার।

প্রজাতির নাম 'ল্যাসমেনিয়া ডানোভ্যানি'। এই 'গণের' অন্য প্রজাতি 'ল্যাসমেনিয়া ট্রপিকা' নানা ধরনের ত্বকীয় সংক্রমণ ঘটায় (চিত্র-৩)। তা নাক ও মুখেও ছড়াতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষে এই রোগের সংক্রমণের ইতিহাস প্রায় একশত বছরের। এরমধ্যে আসাম, বেঙ্গল ও বিহারে এই রোগ বারবার বিস্তার লাভ করেছে বলে জানা যায়।

আসামে ১৮৯০-১৯০০ সনে যে কালাজ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল তাতে গ্রামের

চিত্র-৩ 'ল্যাসমেনিয়া' দ্বারা ত্বকীয় সংক্রমণ।

Banglainternet.com

পর গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৭ সনে তা আবার তখনকার বেঙ্গল ও আসামে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংক্রমণ দীর্ঘদিন ছড়িয়ে থাকলেও ১৯২৫ সনে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল ও অসংখ্য প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৩৭ সনে বিহারেও এই রোগ যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। তবে আজকাল চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও চিকিৎসার বদৌলতে আমাদের মতো অনুন্নত দেশেও এই রোগ-বালাইয়ের উপদ্রবের কথা সচরাচর খুব একটা শোনা যায় না। কিন্তু এই রোগের ওষুধ আবিষ্কারের আগে শতকরা প্রায় ৯০ জন রোগীর মৃত্যু হত।

ভৌগলিক বিস্তৃতি ও সংক্রমণের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কালাজ্বরের কয়েকটি প্রকারভেদ রয়েছে। এরমধ্যে ক. চৈনিক ধরন (শিশু ও কুকুরের সংক্রমণ) খ. ভারতীয় ধরন (পরিণত মানুষে সংক্রমণ) গ. ভূমধ্যসাগরীয় ধরন (শিশু ও কুকুরে সীমাবদ্ধ) ঘ. সুদানীয় ধরন (ত্বকের/মুখের ঘা সৃষ্টি করে) ঙ. দক্ষিণ আফ্রিকীয় ধরন (সব বয়সের মানুষে সংক্রমিত হয়)।

'ট্রাইপ্যানোসোমা' : এই পরজীবী প্রোটোজোয়া প্রজাতিগুলো প্রায় সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সংক্রমিত হতে দেখা যায়। এগুলো আকৃতিতে সরু লম্বাটে ধরনের এবং বেশ সক্রিয় (চিত্র-৪)। উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও বিভিন্ন স্তন্যপায়ী পোষকের রক্ত, কোষকলায় এদেরকে বিচরণ করতে দেখা যায়। পোষকে এরা সাধারণ বিভক্তির মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। এই পরজীবীর বাহক এক ধরনের রক্তচোষক মাছি। এই মাছি সাধারণভাবে 'সেট্‌সি ফ্লাই' নামে পরিচিত। 'গণ' পরিচয়ে 'গ্লসিনা'। এই পরজীবী এককোষী প্রাণীর সংক্রমণে পোষকের 'মারাত্মক ঘুম রোগ' বা 'স্লিপিং সিকনেস' দেখা যায়। এবং এই রোগ আফ্রিকা মহাদেশে সীমাবদ্ধ বলে এটিকে 'আফ্রিকান স্লিপিং সিকনেস' বলা হয়ে থাকে।

চিত্র-৪ 'ট্রাইপ্যানোসোমা'-এর দলবদ্ধ রূপ।

পরজীবী 'ট্রাইপ্যানোসোমা' প্রাণীটি ১৯৪১ সনে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরজীবীবিদ্যার জন্ম-ইতিহাস বিবেচনায় তা প্রাচীন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা, সার্বিকভাবে এই বিষয়টির নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ খুব বেশি দিনের নয়। এই পরজীবীর সংক্রমণ ভারতে ঘোড়া ও অন্যান্য জীবজন্তুতে দেখা দেয় ১৮৮০ সনে। ফোর্ডে ও ডাটন ১৯০২ সনে প্রথম মানুষের মারাত্মক ঘুম রোগের প্রারম্ভিক স্তর—'গাম্বিয়া জ্বর'-এর সন্ধান দেন। এই জ্বরের শেষ পরিণতি ছিল কাল-ঘুম — যা থেকে রোগীর জেগে উঠার সম্ভাবনা এক সময় একেবারে ছিল না বলা চলে।

BanglaInternet.com

তবে ঐতিহাসিক আমলে কৃতদাস ব্যবসায়ীদের এই রোগের প্রকোপ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা ছিল। এই রোগের প্রাথমিক সংক্রমণের বহিঃপ্রকাশ হত গলার গ্রন্থিতে। তখনকার দিনে কৃতদাস ব্যবসায়ীরা এই কারণে ফোলা গল-গ্রন্থিযুক্ত নিগ্রো কৃতদাস সংগ্রহ করত না। কারণ, সংক্রমিত কৃতদাসদের বেশিরভাগই পথে মারা যেত। ধারণা করা হয়, কৃতদাস ব্যবসার মাধ্যমে এই পরজীবী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে উপযুক্ত বাহকের অভাবে তা পশ্চিম গোলার্ধে বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

দু'টি নির্দিষ্ট ট্রাইপ্যানোসোমীয় প্রজাতি আফ্রিকা, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বাসিন্দাদের আক্রমণ করে থাকে। এরমধ্যে আফ্রিকীয় ধরন 'ট্রাইপ্যানোসোমা ব্রুসাই' প্রায় সকল ধরনের বন্য ও গৃহপালিত প্রাণী ও মানুষে সংক্রমিত হয়। মাছি 'গ্লাসিনা মর্সিটান্স'-এর দ্বারা এ পরজীবীগুলো বাহিত হয়ে থাকে। এটা ধারণা করা হয় যে, এই ট্রাইপ্যানোসোম প্রজাতি থেকে মানুষের দেহে সংক্রামক পরজীবী প্রোটোজোয়া 'ট্রাইপ্যানোসোমা গ্যাম্বিয়েনস' ও 'ট্রাইপ্যানোসোমা রোডেসিয়েন্সি'-এর উদ্ভব হয়েছে।

আমেরিকার ট্রাইপ্যানোসোমের মধ্যে 'ট্রাইপ্যানোসোমা ইকুইপেরডাম' ও 'ট্রাইপ্যানোসোমা ইকুইনাম' উল্লেখযোগ্য। তবে সেখানে বাহক সেট্‌সি মাছি না থাকায় এর সংক্রমণ খুব একটা দেখা যায় না।

মানুষের অন্ত্রীয় পরজীবী ফ্লাজেলেট প্রোটোজোয়াগুলো সাধারণত পাঁচটি গণ-এ সীমিত বলে জানা যায়। এগুলোর আক্রমণে মুখগহ্বর, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, যকৃত ও স্ত্রী জননাঙ্গ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। ফলে নানা ধরনের জটিল সংক্রমণ ও পেটের পীড়া দেখা দেয়। এই শ্রেণীর পরজীবী প্রাণীগুলোর মধ্যে ট্রাইকোমোনাস, জিয়ার্ডিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

'ট্রাইকোমোনাস' গণের সদস্যগুলো মাকু বা নাসপাতি আকৃতির। এদের তিন থেকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুখ সম্মুখ-তরঙ্গিত ঝিল্লি রয়েছে। এগুলোর সাহায্যে এরা চলাচল করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এগুলোর সংক্রমণের আধিক্য দেখা যায়। সাধারণত এই প্রাণীগুলোর মধ্য-পোষকের প্রয়োজন হয় না।

মানুষের অন্ত্রীয় পরজীবী 'ট্রাইকোমোনাস হোমিনিস' সংক্রমণ উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় তুলনামূলকভাবে কম। তবে আমাদের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অধিবাসীরা এই পরজীবীর শিকার হয় সহজে। এর আক্রমণের ফলে দীর্ঘমেয়াদী উদরাময় দেখা দেয়।

পরজীবী জিয়ার্ডিয়ার (এক সময় তা 'ল্যাম্বলিয়া' নামে পরিচিত ছিল) দেহাকৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিছুটা অদ্ভুত ধরনের বলা যায়। এদের কেন্দ্রক ও আনুষঙ্গিক অর্গেনেলিসমূহ বিভক্তির মাধ্যমে অনেকটা 'পিয়ামিজ' জমজের আকার ধারণ করে

Banglainternet.com

পর গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৭ সনে তা আবার তখনকার বেঙ্গল ও আসামে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংক্রমণ দীর্ঘদিন ছড়িয়ে থাকলেও ১৯২৫ সনে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল ও অসংখ্য প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৩৭ সনে বিহারেও এই রোগ যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। তবে আজকাল চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও চিকিৎসার বদৌলতে আমাদের মতো অনুন্নত দেশেও এই রোগ-বালাইয়ের উপদ্রবের কথা সচরাচর খুব একটা শোনা যায় না। কিন্তু এই রোগের ওষুধ আবিষ্কারের আগে শতকরা প্রায় ৯০ জন রোগীর মৃত্যু হত।

ভৌগলিক বিস্তৃতি ও সংক্রমণের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কালাজ্বরের কয়েকটি প্রকারভেদ রয়েছে। এরমধ্যে ক. চৈনিক ধরন (শিশু ও কুকুরের সংক্রমণ) খ. ভারতীয় ধরন (পরিণত মানুষে সংক্রমণ) গ. ভূমধ্যসাগরীয় ধরন (শিশু ও কুকুরে সীমাবদ্ধ) ঘ. সুদানীয় ধরন (ত্বকের/মুখের ঘা সৃষ্টি করে) ঙ. দক্ষিণ আফ্রিকীয় ধরন (সব বয়সের মানুষে সংক্রমিত হয়)।

'ট্রাইপ্যানোসোমা' ঃ এই পরজীবী প্রোটোজোয়া প্রজাতিগুলো প্রায় সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সংক্রমিত হতে দেখা যায়। এগুলো আকৃতিতে সরু লম্বাটে ধরনের এবং বেশ সক্রিয় (চিত্র-৪)। উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও বিভিন্ন স্তন্যপায়ী পোষকের রক্ত, কোষকলায় এদেরকে বিচরণ করতে দেখা যায়। পোষকে এরা সাধারণ বিভক্তির মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। এই পরজীবীর বাহক এক ধরনের রক্তচোষক মাছি। এই মাছি সাধারণভাবে 'সেট্‌সি ফ্লাই' নামে পরিচিত। 'গণ' পরিচয়ে 'গ্লসিনা'। এই পরজীবী এককোষী প্রাণীর সংক্রমণে পোষকের 'মারাত্মক ঘুম রোগ' বা 'স্লিপিং সিকনেস' দেখা যায়। এবং এই রোগ আফ্রিকা মহাদেশে সীমাবদ্ধ বলে এটিকে 'আফ্রিকান স্লিপিং সিকনেস' বলা হয়ে থাকে।

চিত্র-৪ 'ট্রাইপ্যানোসোমা'-এর দলবদ্ধ রূপ।

পরজীবী 'ট্রাইপ্যানোসোমা' প্রাণীটি ১৯৪১ সনে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরজীবীবিদ্যার জন্ম-ইতিহাস বিবেচনায় তা প্রাচীন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা, সার্বিকভাবে এই বিষয়টির নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ খুব বেশি দিনের নয়। এই পরজীবীর সংক্রমণ ভারতে ঘোড়া ও অন্যান্য জীবজন্তুতে দেখা দেয় ১৮৮০ সনে। ফোর্ডে ও ডাটন ১৯০২ সনে প্রথম মানুষের মারাত্মক ঘুম রোগের প্রারম্ভিক স্তর—'গাম্বিয়া জ্বর'-এর সন্ধান দেন। এই জ্বরের শেষ পরিণতি ছিল কাল-ঘুম — যা থেকে রোগীর জেগে উঠার সম্ভাবনা এক সময় একেবারে ছিল না বলা চলে।

BanglaInternet.com

তবে ঐতিহাসিক আমলে কৃতদাস ব্যবসায়ীদের এই রোগের প্রকোপ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা ছিল। এই রোগের প্রাথমিক সংক্রমণের বহিঃপ্রকাশ হত গলার গ্রন্থিতে। তখনকার দিনে কৃতদাস ব্যবসায়ীরা এই কারণে ফোলা গল-গ্রন্থিযুক্ত নিগ্রো কৃতদাস সংগ্রহ করত না। কারণ, সংক্রমিত কৃতদাসদের বেশিরভাগই পথে মারা যেত। ধারণা করা হয়, কৃতদাস ব্যবসার মাধ্যমে এই পরজীবী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে উপযুক্ত বাহকের অভাবে তা পশ্চিম গোলার্ধে বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

দু'টি নির্দিষ্ট ট্রাইপ্যানোসোমীয় প্রজাতি আফ্রিকা, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বাসিন্দাদের আক্রমণ করে থাকে। এরমধ্যে আফ্রিকীয় ধরন 'ট্রাইপ্যানোসোমা ব্রুসাই' প্রায় সকল ধরনের বন্য ও গৃহপালিত প্রাণী ও মানুষে সংক্রমিত হয়। মাছি 'গ্লাসিনা মর্সিটান্স'-এর দ্বারা এ পরজীবীগুলো বাহিত হয়ে থাকে। এটা ধারণা করা হয় যে, এই ট্রাইপ্যানোসোম প্রজাতি থেকে মানুষের দেহে সংক্রামক পরজীবী প্রোটোজোয়া 'ট্রাইপ্যানোসোমা গ্যাম্বিয়েনস' ও 'ট্রাইপ্যানোসোমা রোডেসিয়েন্সি'-এর উদ্ভব হয়েছে।

আমেরিকার ট্রাইপ্যানোসোমের মধ্যে 'ট্রাইপ্যানোসোমা ইকুইপেরডাম' ও 'ট্রাইপ্যানোসোমা ইকুইনাম' উল্লেখযোগ্য। তবে সেখানে বাহক সেট্‌সি মাছি না থাকায় এর সংক্রমণ খুব একটা দেখা যায় না।

মানুষের অন্ত্রীয় পরজীবী ফ্লাজেলেট প্রোটোজোয়াগুলো সাধারণত পাঁচটি গণ-এ সীমিত বলে জানা যায়। এগুলোর আক্রমণে মুখগহ্বর, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, যকৃত ও স্ত্রী জননাঙ্গ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। ফলে নানা ধরনের জটিল সংক্রমণ ও পেটের পীড়া দেখা দেয়। এই শ্রেণীর পরজীবী প্রাণীগুলোর মধ্যে ট্রাইকোমোনাস, জিয়ার্ডিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

'ট্রাইকোমোনাস' গণের সদস্যগুলো মাকু বা নাসপাতি আকৃতির। এদের তিন থেকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুখ সম্মুখ-তরঙ্গিত ঝিল্লি রয়েছে। এগুলোর সাহায্যে এরা চলাচল করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এগুলোর সংক্রমণের আধিক্য দেখা যায়। সাধারণত এই প্রাণীগুলোর মধ্য-পোষকের প্রয়োজন হয় না।

মানুষের অন্ত্রীয় পরজীবী 'ট্রাইকোমোনাস হোমিনিস' সংক্রমণ উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় তুলনামূলকভাবে কম। তবে আমাদের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অধিবাসীরা এই পরজীবীর শিকার হয় সহজে। এর আক্রমণের ফলে দীর্ঘমেয়াদী উদরাময় দেখা দেয়।

পরজীবী জিয়ার্ডিয়ার (এক সময় তা 'ল্যাম্বলিয়া' নামে পরিচিত ছিল) দেহাকৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিছুটা অদ্ভুত ধরনের বলা যায়। এদের কেন্দ্রক ও আনুষঙ্গিক অর্গেনেলিসমূহ বিভক্তির মাধ্যমে অনেকটা 'সিয়ামিজ' জমজের আকার ধারণ করে

BanglaInternet.com

(চিত্র-৫) এগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগে বসবাস করে এবং সেখানকার মিউকাস কোষে এঁটে থেকে পোষক দেহ থেকে সরাসরি খাদ্যরস শুষে নেয়। সম্ভবত এই কারণে এগুলোকে গবেষণাগারে লালন-পালন করা যায় না। এই পরজীবীগুলো মাছ থেকে নিয়ে মানুষ পর্যন্ত সকল ধরনের প্রাণীকে আক্রমণ করে থাকে।

চিত্র-৫ 'জিয়ার্ডিয়া' প্রজাতি।

মানুষের এই পরজীবী প্রজাতিকে আমেরিকান লেখকগণ 'জিয়ার্ডিয়া ল্যামব্লিয়া' নামে চিহ্নিত করেছেন। তা-ই ইউরোপে আবার 'জিয়ার্ডিয়া ইন্টেসটিনালিস' নামে পরিচিত।

পরজীবী অ্যামিবা দল

এই এককোষী প্রাণীগুলো বর্গ অ্যামোয়বিডার সদস্য। এদের দেহে শক্ত আবরণ বা শেল নাই। এদের ব্যাস ১২-২৫ মাইক্রোমিটার। এগুলো লোব আকারের ভ্রমপদ বা সুডোপড-এর সাহায্যে চলাচল করে। সাধারণ বিভাজনের মাধ্যমে এই প্রাণীগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অ্যামিবা দলের ব্যাতিহারজীবী ও পরজীবী সদস্যগুলো পরিবার অ্যান্ডোমোবিডি-তে সীমাবদ্ধ। এদের পরজীবিতার পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত এবং তা উইপোকা থেকে নিয়ে মানুষ পর্যন্ত। বেশিরভাগ পরজীবী অ্যামিবা সিস্ট তৈরি করে থাকে। এগুলো এভাবে পোষকের দেহের বাইরে, নিজেদের নিরাপদে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। সাধারণত কোন বাহক ছাড়াই এ সিস্ট ময়লা পাণীয়ের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। এ দলের পরজীবী অ্যামিবাগুলো সাধারণত পোষকের বৃহদান্ত্রে বসবাস করে। এর মধ্যে 'অ্যান্টামোবা হিস্টোলাইটিকা' আমাদের বেশ পরিচিত এবং সময় সময় তা অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে থাকে। এর সংক্রমণের দ্বারা মানুষের যে রক্তামাশয় দেখা দেয় তা সময়মতো প্রতিরোধ করতে না পারলে প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক জরিপে দেখা গেছে যে, আমাদের গ্রীষ্মমন্ডলের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মানুষ এর আক্রমণে কমবেশি আক্রান্ত। খোদ আমেরিকার মতো উন্নত দেশেও ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সনের মধ্যে এই পরজীবীর সংক্রমণে কয়েক শ' লোকের মৃত্যু ঘটেছিল।

Banglainternet.com

এই পরজীবী প্রাণীগুলো বৃহদান্ত্রের বাসিন্দা হলেও ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের দিকেও এর সংক্রমণ হয়। যদিও আমাদের ৬ ফুট লম্বা বৃহদান্ত্রের যে কোন জায়গায় এর দ্বারা প্রদাহ হতে পারে, তবুও সিকাম ও কোলনে এর সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি।

অ্যাপিনডিক্সেও এর সংক্রমণ দেখা যায়। তবে এর সংক্রমণে যকৃতের প্রদাহ বা লিভার অ্যাবসিস হয়— যা প্রাণনাশের হুমকিস্বরূপ। সাধারণভাবে এটা ধরে নেয়া হয় যে, এই পরজীবী প্রাণীগুলো পরিপাকতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ কোষকলা বিনষ্ট করে।

এই প্রজাতির কাছাকাছি আরো দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রজাতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ 'অ্যান্টামোবা কোলাই' ও অ্যাভোলিমেক্স নানা'। এই পরজীবী প্রাণীগুলো মানুষ ছাড়াও বানর, ইঁদুর, শূকর, কুকুর ইত্যাদিতে সংক্রমিত হতে দেখা যায়।

পরজীবী স্পোরজোয়া

এই বৃহৎ দলের প্রাণীগুলোর আচার-আচরণ সাধারণ এককোষী প্রাণীর মতো হলেও এদের মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। যেমন, এদের পরিণত পর্যায়ে চলনাঙ্গ নাই এবং জীবন-চক্রে সাধারণত যৌন-অযৌন দু'ধরনের জটিল প্রথা রয়েছে। এখানে ৪টি বর্গ থাকলেও বিশেষ ক্ষতিকারক দিক দিয়ে বর্গ-প্লাজমোডিয়াইডা উল্লেখযোগ্য। এখানকার পরজীবী 'প্লোজমোডিয়াম' গণের সংক্রমণে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়ে থাকে। এই প্লাজমোডিয়াম প্রজাতির মধ্য-পোষক/বাহক মশা। আমাদের জাতীয় জীবনে জনস্বাস্থ্য সমস্যায় মশা ও ম্যালেরিয়া এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মশা নিয়ে বসবাস করা ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই যেন। আর সেই সূত্রে ম্যালেরিয়াও আমাদের যখন-তখন আক্রমণ করে।

ম্যালেরিয়া সৃষ্টিকারী এককোষী পরজীবী আবিষ্কৃত হয় ১৮৮০ সনে এবং তা রোগীর রক্ত বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। মশা দ্বারা যে এটা এক দেহ থেকে অন্য মানবদেহ বা প্রাণীদেহে ছড়ায় তা প্রমাণিত হয় ১৮৯৮ সনে। এই সময় থেকে মানব দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রমণে 'অ্যানোফিলিস' প্রজাতির মশার গুরুত্ব সম্পর্কে নানা তথ্য প্রকাশিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত-বার্মা, ভূমধ্যসাগরীয় এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যুদ্ধে নিহত সৈনিকের সংখ্যার চেয়ে এই রোগ পাঁচগুণ বেশি সৈনিকের জীবননাশ করেছিল বলে জানা যায়।

কুইনিন আবিষ্কারের আগে পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া লক্ষ-কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে — যার ফলে সাম্প্রতিককালে 'ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ' অভিযান অত্যন্ত গতিশীল এক জরুরী প্রকল্প হিসেবে নানা দেশে কার্যকর রয়েছে, আর তা রয়েছে আমাদের বাঁচার তাগিদেই। আমাদের দেশেও তা আছে। যদিও তা সে অর্থে সফল হয়নি। তবে এর প্রকোপ কমেছে। আমেরিকাতে এই প্রকল্প শুরু হয় ১৯৪৭ সনে এবং তা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় মাত্র ৩ বৎসর সময়ের মধ্যে। ভারতে এই সংক্রমণে জনশক্তি অপচয়ের কারণে যে অর্থের ক্ষতি হয় এর পরিমান বছরে ৫০০ মিলিয়ন ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ম্যালেরিয়া নিধন প্রকল্পে শত শত মিলিয়ন ডলার খরচ

BanglaInternet.com

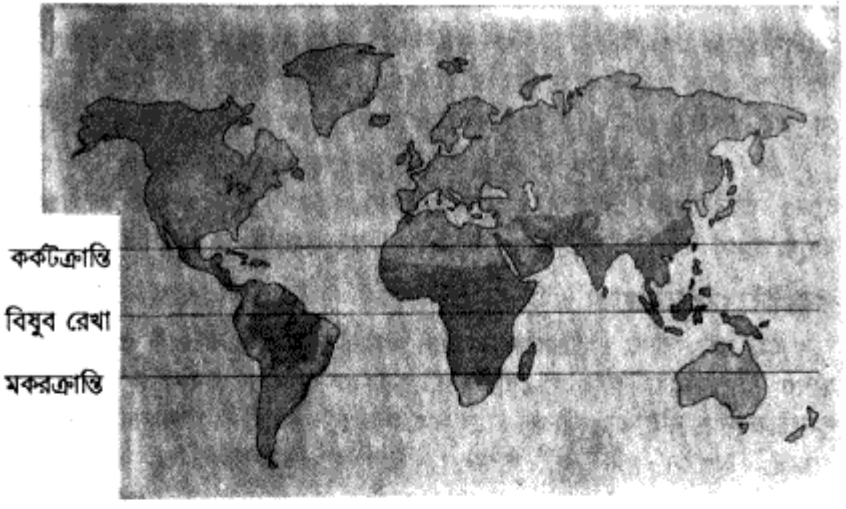

চিত্র–৬ ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি (কালো অংশ)।

করছে এবং তাতে বিশ্ববাসী উপকৃত হচ্ছে নিঃসন্দেহে (চিত্র–৬)।

"প্লাজমোডিয়াম" গণের চারটি প্রজাতি এই রোগ সৃষ্টির কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, 'প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স', 'প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিয়াই' ও 'প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম'। বিরল ক্ষেত্রে 'প্লাজমোডিয়াম ওভেইল'–ও দেখা যায়।

পরজীবী এককোষী প্লাজমোডিয়াম যখন মানবদেহে প্রবেশ করে তা তখন সরাসরি রক্ত প্রবাহে (ইরিথ্রোসাইট) প্রবেশ না করে কোষকলায় নিজেদের আস্তানা গেড়ে বসে। কোষকলায় এগুলো কমপক্ষে দু'টি প্রজন্ম উৎপাদন করে। পরে এই স্তরের পরজীবী এককগুলো কোষকলা ছেড়ে রক্ত প্রবাহে আশ্রয় নেয় এবং অসংখ্য গ্যামেটোসাইটে রূপান্তরিত হয় (চিত্র–৭)। এখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ধরনের গ্যামেট

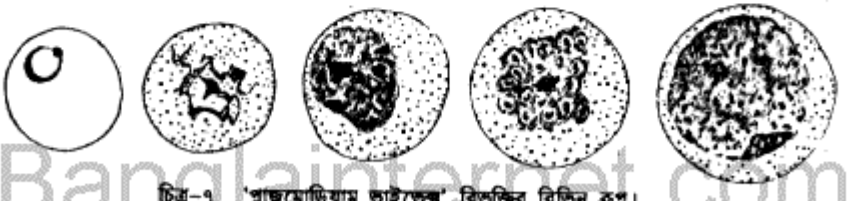

চিত্র–৭ 'প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স' বিভক্তির বিভিন্ন রূপ।

Banglainternet.com

উপস্থিত থাকে। এই উভয় ধরনের এককের মিলনে এদের বংশবৃদ্ধি পেতে থাকে। মশা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে রক্ত চুষে নেয়ার সময় তা মশার পাকস্থলীতে যায়। সেখানে আবার বিভক্ত হয়ে অন্য সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে। তা মশার কামড়ের দ্বারাই বিস্তার লাভ করে। বাহক মশা 'গণের' মধ্যে 'অ্যানোফিলিস', 'কিউলেক্স' ও 'এইডিস' উল্লেখযোগ্য।

কিছু কিছু প্রাণী প্রজাতিতেও ম্যালেরিয়া ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তবে সেই পরজীবী স্পোরজোয়াগুলো 'প্লাজমোডিয়াম'-গণের প্রজাতি নয়। তা 'হিমোপ্রোটিয়াস'-গণের কতিপয় প্রজাতি। যেমন, 'হিমোপ্রোটিয়াস কলুম্বি' কবুতরের একটি সাধারণ পরজীবী প্রজাতি। এর মধ্য-পোষক 'হিপ্পোবসিড' মাছি।

ম্যালেরিয়া বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী এককোষী প্রাণী ছাড়াও স্পোরজোয়ার বর্গ-বেবোসিয়াইডার বেশকিছু সদস্যের অপকারিতার সূত্রে এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এগুলোর সাধারণ অবয়বী আঙ্গিক সম্পর্কে জানা থাকলেও এদের জীবন-চক্র সামান্যই জানা গেছে। এই পরজীবী দলের প্রাণীগুলো আমাদের চারপাশের নানা জাতের গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। পরিবার-বেবোসিয়াইডি-এর সকল প্রজাতি আঠালী (টিক্স-মাকরসা) দ্বারা বাহিত হয়। গণ- 'বেবোসিয়া'র পরজীবীগুলো কেবল রক্তের লোহিত কণিকায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এই গণে ২০টির মতো প্রজাতি থাকলেও এর অল্পসংখ্যক মাত্র গৃহপালিত প্রাণীতে পরজীবী।

বেবোসিয়া গণের পরজীবী দ্বারা যে রোগ-বালাইয়ের সৃষ্টি হয় তা সাধারণভাবে 'পিরোপ্লাজমোসিস' নামে পরিচিত। এই রোগে আক্রান্ত প্রাণীর রক্তে লোহিত কণিকা নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রাণীর প্রস্রাবের সঙ্গে হিমোগ্লোবিন বের হয়ে যায়। এই সংক্রমণে রোগীর জ্বর, রক্তশূন্যতা, জন্ডিস দেখা দেয়। এর সঙ্গে যকৃত ও বৃক্কেরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে।

স্পোরজোয়া পরজীবীর মধ্যে কক্সিডিয়া এককোষী প্রাণীগুলো গৃহপালিত পশুপাখির (যেমন, ঘোড়া, মেষ-ছাগল, শূকর, কুকুর, বিড়াল, গিনি-পিগ্স, হাঁস-মুরগি, কবুতর) যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই রোগের নাম 'কক্সিডিয়োসিস'। এই পরজীবী পোষক প্রাণীর অন্ত্রের ইপিথেলীয় কোষ, বিশেষ ক্ষেত্রে যকৃতকেও আক্রমণ করে। হাঁস-মুরগির খামারে কক্সিডিয়োসিস রোগ সময় সময় মহামারীর আকার ধারণ করে।

Banglainternet.com

হেলমিনথ্‌স ঃ পরজীবীর এক বিস্তৃত জগৎ

হেলমিনথ্‌সকে এক কথায় 'ওয়ার্ম' শব্দে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ইংরেজি 'ওয়ার্ম' শব্দটির পরিভাষাগত অর্থ দাঁড়ায়, 'কৃমি'। মোটামুটি যথার্থ অর্থকরণ বলা যায়। এমন লাগসই অর্থবহ পরিভাষা সম্ভবত বাংলায় খুব বেশি নেই। 'কৃমি' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এসবের পরজীবী আচার-আচরণের কথাটি আমাদের মনে পড়ে যায়। অথচ 'ইংরেজি 'ওয়ার্ম' শব্দটি কিন্তু সে অর্থে তেমন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করতে সক্ষম নয়। প্রাণিজগতের প্রায় সকল পর্বে 'ওয়ার্ম' শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। এমন কি প্রাণীর বিবর্তন শাখার সর্বোচ্চ প্রাণিদল কর্ডাটাতেও আছে। তবে সন্ধিপদী অমেরুদণ্ডী প্রাণীদল, বিশেষ করে কীটপতঙ্গের অপরিণত পর্যায়কে ওয়ার্ম নামে চিহ্নিত করা হয়। তবে পরজীবিতার সূত্রে বিশেষ করে আমাদের জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে হেলমিনথ্‌স বা ওয়ার্ম বলতে আমরা কতগুলো পর্বকে বুঝে থাকি— যার বেশির ভাগ সদস্য অন্তঃপরজীবী জীবন-যাপন করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর পরজীবিতার সূত্রে হেলমিনথ্‌সগুলোকে কয়েকটি পর্বের আওতায় ফেলা যায়। যেমন, 'প্লাটিহেলমিন্থিস' (চ্যাপ্টা কৃমি), 'অ্যাসেলমিন্থিস বা 'নেমাথহেলমিন্থিস' (গোলাকার বা সূতা কৃমি), এবং 'অ্যাকান্থসেফালা' (মাথায় কাঁটাযুক্ত কৃমি)। এসকল দলের বহিরাকার মোটামুটিভাবে ওয়ার্মের মতো। যদিও অনেক ক্ষেত্রে জীবন-চক্র ও অন্যান্য আচার-আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্নতর হতে পারে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে খন্ডবিশিষ্ট 'অ্যানেলিডা' পর্বটিও এই হেলমিনথ্‌স-এর আওতাভুক্ত। তবে পরজীবিতার ধ্যান-ধারণার নির্দিষ্ট অর্থে অ্যানেলিডা দলের সদস্যগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

তুলনামূলকভাবে কিছু পুরানো এক জরিপে দেখা গেছে, পৃথিবীর ২২০ কোটির ওপরে মানুষের মধ্যে ৭.২ কোটি সেসটোড ও প্রায় ১৫ কোটি ট্রেমাটোড (প্লাটিহেলমিন্থিস) এবং ২০০ কোটির ওপরে মানুষ নেমাটোড দ্বারা আক্রান্ত। এসবের আক্রমণ যে শুধু বিরক্তির কারণ তাই নয় বরং যথেষ্ট অনিষ্টকরও। গত চার দশকে এই অবস্থার যে খুব একটা উন্নতি হয়েছে তা বলা যাবে না। কেননা, তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ যেমন ঘটেছে— তেমনি বেড়েছে দারিদ্রতা। ঘটেছে সাধারণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অবনতি। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশও খুব অল্পই হয়েছে সেসব অঞ্চলে। সুতরাং এইসব পরজীবী কৃমির প্রকোপও যে তেমনি বেড়েছে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এক কথায় আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোকে পরজীবী সংক্রমণের স্বর্গরাজ্যই বলা যায়। উন্নত বিশ্ব এসবের

BanglaInternet.com

সংক্রমণের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ বলে এর ক্ষতিকর প্রভাব সেসব এলাকায় সীমিত হয়ে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা তা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেও আনতে সমর্থ হয়েছে।

সবদিক বিবেচনায় হেলমিন্থিস পরজীবী 'ওয়ার্ম' বা কৃমি শব্দটি যথার্থ হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। আপাতঃদৃষ্টে এগুলোর উপাঙ্গ বা পা নেই। এই কৃমিদলের জগৎ সাধারণভাবে অন্তঃপরজীবী হলেও এতে বহিঃপরজীবী, এমনকি ক্ষুদ্র পরভোজী বা প্রিডেটরী প্রাণী রয়েছে। এছাড়া এ গোষ্ঠীতে মুক্তজীবী প্রাণীরাও আছে। পরজীবিতার সূত্রে এখানকার দলগুলোর মধ্যে 'চ্যাপ্টা কৃমি' ও 'সূতাকৃমিগুলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

প্লাটিহেলমিনথ্স বা চ্যাপ্টা কৃমি

এই চ্যাপ্টা কৃমিগুলো দ্বিপার্শ্ব প্রতিসম (বাইলেটারেলি সিমিট্রিক্যাল)। অর্থাৎ এদের মাঝ বরাবর যদি একটি সরল রেখা টানা যায় তবে উভয় পার্শ্ব সমান বা তা দেখতে এক রকমের হবে। এগুলো ওপরে-নিচে চ্যাপ্টা। এদের দেহে একটি বহিঃত্বক (ইপিডারমিস), সাধারণ পরিপাক নালী এবং এর বাইরে মধ্যবর্তী অংশে কোষকলা রয়েছে। এদের দেহ-গহ্বর নাই , তবে স্নায়ুতন্ত্র আছে (চিত্র-১)

এই পর্বে প্রধানত ৩টি শ্রেণী রয়েছেঃ

ক) টারবেলারিয়া

খ) ট্রেমাটোডা

গ) সেস্টয়িডিয়া

টারবেলারীয় সিলিয়াযুক্ত চ্যাপ্টা প্রাণীগুলো বহুল বিস্তৃত এবং মুক্ত জীবন-যাপন করে। এদের মধ্যে প্ল্যানেরীয় প্রাণীগুলো যথেষ্ট পরিচিত এবং জলাশয়ে পাওয়া যায়। এগুলো পরজীবী নয় বলে আমাদের আলোচ্য বিবেচনায় এদের গুরুত্ব খুব একটা নেই।

ট্রেমাটোডা

এ দলের সদস্যরা সাধারণভাবে 'ফ্লুক' নামে পরিচিত এবং সবই পরজীবী জীবন-যাপন করে। একদিকে প্রাণী হিসেবে এগুলো নিম্ন পর্যায়ের (যথাঃ দৈহিক আকার-প্রকার, আচার-আচরণ

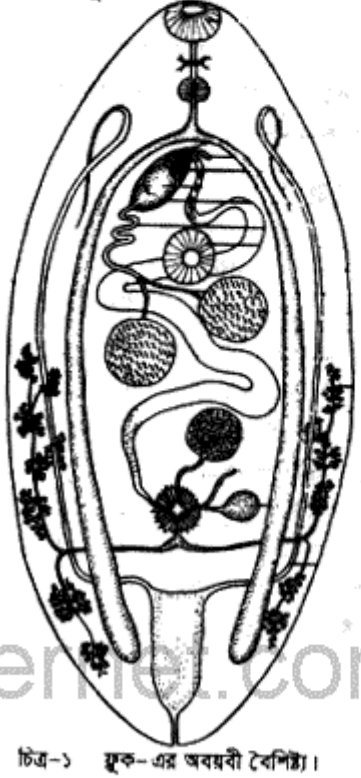

চিত্র-১ ফ্লুক-এর অবয়বী বৈশিষ্ট্য।

BanglaInternet.com

ইত্যাদি), আবার অন্যদিকে এদের উন্নতমানের বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এদের মধ্যে দু'টি প্রধান দল রয়েছে ঃ (ক) মনোজেনেটিক ফ্লুকস্ — এদের অযৌন প্রজনন বা এসেক্চুয়াল রিপ্রোডাকশন নেই। এগুলো সাধারণত জলজ প্রাণীতে বহিঃ/আধাবহিঃ-পরজীবী। (খ) ডাইজেনেটিক ফ্লুকস্ — এদের দু'টি বা এরও অধিক অযৌন প্রজনন হতে দেখা যায়। এগুলোর এক বা একাধিক বিকল্প পোষক রয়েছে। সকল প্রকার মেরুদন্ডী প্রাণীতে এগুলো অন্তঃপরজীবী।

ফ্লুকের দেহাকৃতি পাতার মতো। এর সামনের দিকে একটি পেশীবহুল চোষক বা 'সাকার' রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এদের একটি অঙ্কীয় দ্বিতীয় চোষকও থাকতে পারে— যার সাহায্যে পরজীবী প্রাণীগুলো পোষকের দেহে এঁটে থাকে।

পরিপাকতন্ত্রের শুরুতে পেশীবহুল অধঃগলবিল রয়েছে এবং তা দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে দেহের দু'পাশে বদ্ধ থলির মতো বিস্তৃত — যাকে 'অন্ত্রীয় সীকা' বলে। তবে কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি শাখায়িত হতে দেখা যায়। যেমন, যকৃত-ফ্লুক। এদের স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল ধরনের এবং স্পর্শন বা সংজ্ঞাবহ অঙ্গ প্রায় নেই বললে চলে। প্রাণীগুলোর নিজের রক্ত নেই যার জন্য নিজস্ব রক্ত-সংবহনতন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় না। ফ্লুকের পরিপাক ও রেচনতন্ত্র এমনভাবে শাখায়িত যে, এগুলো পরজীবী প্রাণীটির সারা দেহাঙ্গে খাদ্য যেমন ছড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি সব জায়গা থেকে বর্জ্য বস্তুও সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

প্রজনন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ট্রেমাটোডার যে সকল বিভক্তি আমরা পাই এর মধ্যে উপশ্রেণী মনোজেনা ও ডাইজেনা উল্লেখযোগ্য।

মনোজেনা

এই দলের পরজীবী ফ্লুকগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জলজ মেরুদন্ডী প্রাণী, বিশেষ করে মাছে সংক্রমিত হয় বলে এগুলোর গুরুত্ব আমরা সঠিক অর্থে বুঝি না। এর প্রধান কারণ হয়তো-বা বিজ্ঞানভিত্তিক মাছের চাষ আমাদের দেশে তেমনভাবে জনপ্রিয়তা বা সফলতা লাভ করতে পারেনি। সেই কারণে এগুলোর দ্বারা যে ক্ষয়ক্ষতি হয় এর পরিসংখ্যানও আমাদের খুব একটা জানা নেই। তবে এগুলোর আক্রমণে মাৎস্য চাষ ও উৎপাদনের যে মারাত্মক ক্ষতি হয় এতে কোন সন্দেহ নাই। এই পরজীবী প্রাণীগুলো মাছের ফুল্‌কা ও ত্বকের সংক্রমণ ঘটায়। এছাড়া এগুলো কোন কোন উভচর প্রাণীর, কচ্ছপের মূত্রথলি ও মুখ-গহ্বরে বসবাস করে। জলহস্তীর চোখেও এই পরজীবী প্রাণীর সংক্রমণ দেখতে পাওয়া যায়। মনোজেনার সদস্যগুলো তুলনামূলকভাবে বড় ডিম দেয় এবং এদের শূককীট পর্যায় সরাসরি নির্দিষ্ট পোষককে আক্রমণ করে। আবার এদের কোন পরিবারের সদস্য একটি একটি করে শূককীট প্রসব করে বলেও জানা গেছে।

Banglainternet.com

ডাইজেনা

সাধারণভাবে পরিচিত ও ক্ষতিকর ট্রেমাটোড পরজীবী প্রাণীগুলো এ দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের দেহ ছোট এবং দেখতে পাতার মতো। এছাড়া এদের কিছু সূতাকৃতির সদস্য রয়েছে। এগুলোর সম্মুখ এবং অঙ্কীয় চোষক থাকে। এই দ্বিতীয় চোষকটিকে 'অ্যাসিটাবুলাম' বলা হয়। এদের দেহত্বক কাঁটা ও আঁশযুক্ত। এ দলের পরজীবী প্রাণীগুলোর কোন 'গণের' সদস্যদের কাঁটাওয়ালা কর্ষিকা বা 'টেনটেকল্‌স' হতে দেখা যায়। এসব পরজীবী ট্রেমাটোডগুলোর বেশিরভাগ উভলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ প্রজনন এককগুলো একই প্রাণী দেহে অবস্থিত। সাধারণত এদের একই দেহে দু'টি শুক্রাশয় ও একটি ডিম্বাশয় থাকে।

বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের পরজীবী প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত রোগের মধ্যে 'সিস্টোসোমাইয়াসিস' অন্যতম বলে ধরা হয়। তুলনামূলক পর্যালোচনায় ম্যালেরিয়া ও হুক-ওয়ার্ম সংক্রমণের কথা এসে গেলেও উল্লেখিত দু'টি রোগের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে অনেকাংশে। সেদিক দিয়ে সিস্টোসোম পরজীবী সংক্রমণটা স্বাভাবিকভাবে প্রাধান্য পেয়ে যায়। সিস্টোসোমের ওপর যথেষ্ট গবেষণা হলেও এখনো এদের লাগসই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার খুব উন্নতি হয়নি।

এক জরিপে (১৯৪৭) দেখা গেছে, পৃথিবীতে প্রায় ১২ কোটি লোক এই পরজীবী হেলমিন্থিসে আক্রান্ত— যার ৫ কোটির মতো লোক প্রাচ্যের বাসিন্দা। পক্ষান্তরে ১৯৫০ সনের একই ধরনের জরিপে দেখা গেছে, প্রাচ্যে এই সংক্রমণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক দশক আগেকার এই জরিপ পর্যালোচনায় সহজে অনুমান করা যায় যে, তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে আমাদের মতো বিজ্ঞান-বর্জিত, দরিদ্র, ঘন বসতিপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই সংক্রমণের প্রকোপ যে আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এদের আক্রমণে রোগীর তাৎক্ষণিক মৃত্যু না হলেও আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে কর্মক্ষমতা হারায়। কিরম্যান (১৯৫৯) এই ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব পরিবেশন করেছেন, তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। লাল চীন ১৯৫০ সনে ফরমোসা আক্রমণের যে পরিকল্পনা করেছিল তা সিস্টোসোম পরজীবীর মারাত্মক সংক্রমণের কারণে ৬ মাস পিছিয়ে দেয়। তখন চীনা সেনাবাহিনীর ৩০ থেকে ৫০ হাজার সৈন্য এই রোগের শিকার হয়েছিল।

পরজীবী সিস্টোসোম : মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী সিস্টোসোমগুলো পরিবার-সিস্টোসোমাসিডি ও গণ-সিস্টোসোমার অন্তর্ভুক্ত। এই রক্তবাহিত পরজীবী ওয়ার্মগুলো মানুষ বা অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষুদ্র মেজেনটেরিক বা শ্রোণী ধমনীতে বসবাস করে। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন, প্রজাতি 'সিস্টোসোমা নেজালী' গবাদি-পশুর গলবীলীয় শ্লেষ্মার ধমনীতে আস্তানা গাড়ে। স্ত্রী সিস্টোসোমগুলো ক্ষুদ্র

Banglainternet.com

ক্ষুদ্র রক্ত-ধমনীতে ডিম দেয়। 'সিস্টোসোমা জাপোনিকাম' প্রতিদিন প্রায় ৩৫০০টি ডিম দিয়ে থাকে। ডিম থেকে যে ভ্রূণ বের হয়, তা রক্তবাহিত হয়ে অন্ত্রে ও মূত্রথলির কোষকলায় এবং পরিশেষে তা অঙ্গের নালিকা-গহ্বর বা লুমেনে প্রবেশ করে। সেখান থেকে পোষকের মলমূত্র দ্বারা বাহিত হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলো যকৃৎ, ফুসফুস ইত্যাদিতেও সংক্রমণ ঘটায়। এগুলো সাধারণত ৫টি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এদের জীবন-চক্র সম্পন্ন করে। যথা— মিরাসিডিয়াম, প্রাথমিক স্পোরোসিস্ট, পরিণত প্রাথমিক স্পোরোসিস্ট, নতুন কন্যকা স্পোরোসিস্ট ও পরিণত স্পোরোসিস্ট (চিত্র-২)। এদের আয়ু কয়েক বছরও হতে পারে।

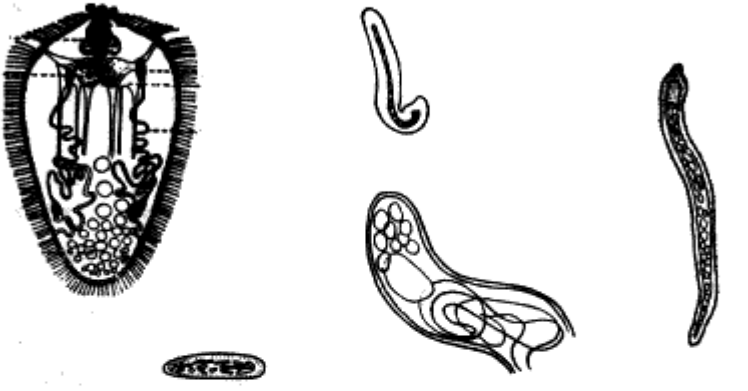

চিত্র-২ 'সিস্টোসোম'-এর পর্যায়িক স্তরসমূহ।

মানুষ প্রধানত ৩টি প্রজাতির সিস্টোসোম দ্বারা আক্রান্ত হয়। যথা— 'সিস্টোসোমা হিমাটোবিয়াম', 'সিস্টোসোমা ম্যানসনি' ও 'সিস্টোসোমা জাপোনিকাম'। এদের আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে রোগীর 'খুসখুসে কাশি থেকে নিয়ে চুলকানি, ফুলা ও চর্মরোগের সূচনা হয়। পরে অধিবিষ জাতীয় এলার্জীয় বিক্রিয়া ও জ্বর দেখা দেয়। এক সময়ে এর ফলে উদরের ব্যথাসহ যে উদরাময় হয় তাতে মলে রক্ত ও শ্লেষ্মার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সংক্রমণ বাড়লে প্রস্রাবেও রক্ত আসে। তা থেকে রক্তশূন্যতা ও নানা ধরনের মারাত্মক শারীরিক জটিলতা দেখা দেয় (চিত্র-৩)।

মানুষ ছাড়াও উপরোক্ত ৩টি পরজীবী প্রজাতি বিভিন্ন প্রাণীকে আক্রমণ করে। যেমন, 'সিস্টোসোমা ম্যানসনি' বানর ও বাঁদুরজাতীয় প্রাণী এবং 'জাপোনিকাম' গবাদি-পশু, ছাগল, শূকর, কুকুর ইত্যাদিকে আক্রমণ করে থাকে। এই প্রজাতিগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি নির্দিষ্ট শামুক জাতে মধ্য-পোষক। এই মধ্য-পোষক থেকে জলজ প্রাণীর মাধ্যমে আবার মানুষকে সংক্রমিত করে।

BanglaInternet.com

অন্যান্য পরজীবী টেমাটোডের মধ্যে ফুসফুস বা লাঙ-ফ্লুক মানুষ, মাংসাশী

চিত্র-৩ জটিল 'সিস্টোসোম' আক্রান্ত রোগী।

প্রাণী, ইঁদুর, শূকর ও অপুসামের ফুসফুসকে আক্রমণ করে। এই সংক্রমণকারী পরিণত পরজীবীগুলো ফুসফুসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পোষক-কোষকলা এদের চতুর্দিকে 'সিস্ট' বা পকেট তৈরি করে ফেলে। এই সিস্ট ফেটে যে ডিম বের হয় তা শ্বাসনালী ধরে থুথুর সাথে বাইরে বের হয়ে আসে। এগুলোরও মধ্য-পোষক শামুক, কাঁকড়া ইত্যাদি।

যকৃৎ বা লিভার-ফ্লুক ঃ মানুষ ও নানা ধরনের গৃহপালিত পশুর যকৃত ও পিত্তনালীতে যে সকল পরজীবী ফ্লুক দেখা যায় সেগুলো প্রধানত ফেসিয়োলিডি পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের 'ফেসিয়োলা' ও 'ফেসিয়োলয়িডেস'-গণ দু'টি মানুষ গবাদি-পশু, ভেড়া-ছাগল ইত্যাদির যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। পাতার মতো দেখতে এই পরজীবী প্রাণীগুলোর শাখায়িত প্রজনন অঙ্গ ও পেঁচানো জরায়ু রয়েছে।

পোষকের দেহ থেকে নির্গত 'ফেসিয়োলা'-এর ডিম ২ সপ্তাহের মধ্যে ফোটে এবং মধ্য-পোষক শামুকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শূককীটের মতো বেড়ে উঠে। পাঁচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই অপরিণত প্রাণীগুলো মধ্য-পোষকের দেহ ছেড়ে জলজ উদ্ভিদের গায়ে এঁটে থাকে। সেখান থেকে এগুলো প্রধান পোষকে স্থানান্তরিত হয়। এগুলোর উল্লেখযোগ্য প্রজাতিগুলো হচ্ছে ঃ 'ফেসিয়োলা হেপাটিকা' 'ফেসিয়োলা জাইগান্‌টিকা' ও 'ফেসিয়োলয়িডেস ম্যাগ্‌না' ইত্যাদি।

কিছু কিছু পরজীবী বিভিন্ন পাখি প্রজাতিতেও সংক্রমিত হতে দেখা যায়।

শ্রেণীঃ সেস্টোয়িডিয়া বা ফিতা কৃমি

সকল প্রাণিদলের মতো এই শ্রেণীর প্রাণীগুলোর মধ্যেও কিছু আদি, কিছু আধুনিক সদস্য রয়েছে। দেহ-সংগঠন মাত্রার দিক দিয়ে স্বভাবতই আদি প্রাণীগুলো তুলনামূলকভাবে আধুনিক প্রাণীগুলো থেকে কম গুছালো বা অন্যভাবে বলতে গেলে কম দক্ষ। সেই সূত্রে কিছু আদি সদস্য বাদ দিলে একটি পরিণত ফিতা কৃমি দেখতে একটি পূর্ণ প্রাণী পরিবারের মতো মনে হয়। অর্থাৎ এই পরজীবীগুলো কখনো

banglainternet.com

কখনো একটির পর একটি জোড়া লাগানো অসংখ্য (শত শত) প্রাণী–এককের দীর্ঘ শিকলের মতো বা রেলগাড়ির বগীর মতো। যার জন্য এগুলোকে সাধারণভাবে ফিতা কৃমি নামে অভিহিত করা হয়। এগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এদের জীবন–চক্রের কোন অবস্থাতেই পরিপাক তন্ত্র নাই। এর প্রয়োজনও হয় না। কেননা, এই বিচিত্র প্রাণীগুলো এদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পোষকের দেহ থেকে সরাসরি খাদ্যরস সংগ্রহ করে থাকে। প্রাণিজগতে বিবর্তনভিত্তিক অভিযোজনের এটি একটি সুন্দর উদাহরণ।

শ্রেণী সেস্টোয়িডিয়া–তে দু'টি উপশ্রেণী রয়েছেঃ

(ক) সেস্টোডারিয়া

(খ) সেস্টোডা

সেস্টোডারিয়া উপশ্রেণীর প্রাণীগুলোতে খন্ডাংশ থাকে না এবং এদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের এক সেট জননাঙ্গ ও পেছনের দিকে জননরন্ধ্র রয়েছে। এই দলের পরিণত সদস্যগুলো জলজ প্রাণী, বিশেষ করে মাছ, মিঠাপানির কচ্ছপে পরজীবী। এদের মধ্য–পোষক রয়েছে।

অন্যদিকে সেস্টোডা প্রাণীগুলোর দেহ নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা অসংখ্য খন্ডাংশের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। এই খন্ডাংশ বা জীবের এককগুলোকে 'প্রোগ্লোটিড্স' বলে (চিত্র–৪)। অবশ্য অল্পসংখ্যক প্রাণীতে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

এদের শিকলের মতো লম্বা দেহের এক মাথায় 'স্কোলেক্স' নামক অঙ্গ রয়েছে— যা প্রধানত পোষকের দেহের অভ্যন্তরে আঁকড়ে ধরে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। ফিতা কৃমির স্কোলেক্সের আকার–আঙ্গিকের ভিন্নতা দেখা যায়। তা প্রজাতি–ভিন্নতার বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা যেতে পারে।

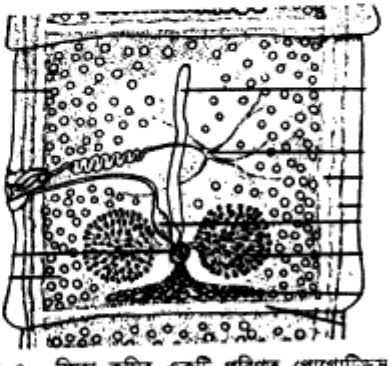

চিত্র–৪ ফিতা কৃমির একটি পরিণত প্রোগ্লোটিড্স।

প্রাণীগুলোর দেহত্বক যথেষ্ট জটিল। পুরো দেহ বরাবর লম্বালম্বি স্নায়ুরজ্জু নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। পেশীতন্ত্রে লম্বা, তির্যক ও গোলাকার পেশী রয়েছে। এই পরজীবীগুলোর প্রতিটি প্রোগ্লোটিডস্–এ পরিপূর্ণ প্রাণীর মতো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রজননতন্ত্র থাকে। কোন কোন প্রজাতিতে এই প্রজননতন্ত্র দু'জোড়াও হয়। এর প্রধান কারণ, পোষক থেকে পোষকে স্থানান্তরের সময় যাতে করে এর কোন একটি একক বা খন্ডাংশ নষ্ট হয়ে গেলেও সম্পূরক অক্ষত অংশটি কার্যকর হয়ে উঠতে পারে।

BanglaInternet.com

এদের জীবন-চক্র ফুকের মতো জটিল নয়। ফিতা কৃমির ডিম থেকে গোলাকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভ্রূণ বের হয়। এ পর্যায়ে এগুলোর নখরের মতো আঁকড়ি রয়েছে। এগুলোকে তখন 'অনকোসেফয়ার' বলা হয়। এ দলের কোন কোন জলজ জাতের অনকোসেঁফয়ার সিলিয়া-আবৃত — যা এদেরকে স্বাধীনভাবে সাঁতরাতে সহায়তা করে। এ পর্যায়ে এগুলো সহজে চিংড়িজাতীয় প্রাণী, মাছ ও অন্যান্য বড় পরভোজী দ্বারা বাহিত হয়ে প্রধান পোষক বা মানুষ পেয়ে গেলে তখন পরিণত ফিতা কৃমিতে বেড়ে উঠে। পূর্ণ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়।

উপশ্রেণী সেস্টোডাতে ১১টি বর্গ রয়েছে। এর মধ্যে আদি-প্রাণীদলের ৪টি পর্ব মাছে পরজীবী। এগুলো আমাদের মাৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকর। মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণী সংক্রমণের ক্ষেত্রে ২টি বর্গ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। সেগুলো হচ্ছে ঃ ছুডোফাইলিডিয়া ও সাইক্লোফাইলিডিয়া। যদিও এর মধ্য থেকে ২৫/৩০ টি পরজীবী ফিতা কৃমী চিহ্নিত করা হয়েছে এর মধ্যে মাত্র ৪টি পরিণত ও ৩টি শূককীট পর্যায়ের প্রজাতিই সহজে মানুষে সংক্রমিত হতে দেখা যায়।

ছুডোফাইলিডিয়া পর্বের ডাইফাইলোবোথ্রিডি পরিবারের গণ— 'ডাইবোথ্রিয়োসেফালাস'-এর প্রজাতিগুলো পরজীবিতার সূত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে ধরা হয়। এরমধ্যে 'ডাইবোথ্রিসেফালাস লেটাস' প্রজাতিটি মানুষের সবচেয়ে বড় ফিতা কৃমি। এর দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ৩০ ফুট ও প্রস্থে আনুমানিক ০.৫ থেকে ১ ইঞ্চি। এর দেহখন্ডাংশ বা প্রোগ্লোটিড্স-এর সংখ্যা ৩ থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত হতে পারে। এগুলো সাধারণত জলজ মধ্য-পোষক মাংসাশী মাছের মাধ্যমে মানুষে সংক্রমিত হয়। এই সংক্রমণ সময় সময় বিশেষ করে শিশুদের জন্য প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সাইক্লোফাইলিডি-বর্গের ৬ টি পরিবারের মধ্যে ২টি পরিবার— টিনিয়াইডি ও হাইমেনোলেপিডিডি-এর সদস্যগুলো মানুষে পরজীবী। এদের মধ্য-পোষক অমেরুদন্ডী/মেরুদন্ডী — দু'রকমেরই হতে দেখা যায়।

এখানকার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ 'টেনিয়া সোলিয়াম'। এই প্রজাতিটি প্রধানত শূকরে পরজীবী হলেও মানুষ এর পরিণত 'প্রোগ্লোটিড' বা সংক্ষিপ্ত প্রোগ্লোটিড্স শিকল দ্বারা আক্রান্ত হয়। উট, কুকুর, বানর ইত্যাদি এদের মধ্য-পোষক। এমনকি এ জাতীয় ফিতা কৃমি মানুষ থেকে মানুষেও ছড়ায়। এগুলো সাধারণত ৬ থেকে ১০ ফুট লম্বা ও ৮ থেকে ৯ শত প্রগ্লোটিড্স সম্বলিত হতে দেখা যায়। এই জাতীয় ফিতা কৃমি পোষক অন্ত্রের কোষকলা ছিদ্র করে রক্তধারা বা লসিকা নালীর মধ্য দিয়ে শরীরের সকল প্রকারের পেশীতে নিজেদের স্থান করে নেয়। এগুলো মানুষের চোখ এবং মগজও আক্রমণ করে। এই ধরনের সংক্রমণের ফলাফল সাধারণত খুব মারাত্মক হয়ে পড়ে।

BanglaInternet.com

সাধারণভাবে গো-মাংসের ফিতা কৃমি নামে পরিচিত 'টেনিয়া সেজিনাটা' মানুষকে আক্রমণকারী এ জাতের পরজীবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও যথেষ্ট বিস্তৃত। সাধারণত ১৫-২০ ফুট লম্বা, তবে বিরল ক্ষেত্রে তা ৫০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে। এদের মধ্য-পোষক সকল ধরনের গৃহপালিত পশু-পাখি। এদের মধ্যে গবাদি-পশুই প্রধান।

পরিবার-হাইমেনোলেপিডি-এর প্রজাতি 'হাইমেনোলেপিস নানা' মানুষের ক্ষুদ্রতম ফিতা কৃমি। একটি পরিণত ফিতা কৃমির দৈর্ঘ্য ০.৫ থেকে ৪ ইঞ্চি। অন্যান্য ফিতা কৃমির মতো এদের মধ্য-পোষকের দরকার হয় না। এ গুলোর জীবন-চক্র একই পোষকে সীমাবদ্ধ থাকে।

অ্যাকান্থসেফালা (কাঁটাযুক্ত মাথাওয়ালা কৃমি)

প্রাণিজগতের পর্ব বিভক্তির শুরুর দিকে অ্যাকান্থসেফালার সদস্যগুলো পর্ব নেমাথহেলমিন্থিস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই দলভুক্তিতে কিছু বৈষম্য দেখা দেয়। সেখানে নেমাথহেলমিন্থিসের চেয়ে প্লাটিহেলমিন্থিসের সঙ্গে এ প্রাণীগুলোর বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, শ্রেণী সেস্টোয়িডিয়ার সঙ্গে এই মিল সর্বাধিক। এইসব বিবেচনায় হেলমিন্থিস বিশেষজ্ঞগণ সাম্প্রতিককালে (বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়) অ্যাকান্থসেফালীয় সদস্যগুলোকে একটি পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পর্বের মর্যাদা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই প্রাণীদল প্রায় সব মেরুদন্ডী প্রাণী, বিশেষ করে মাছ ও পাখির অন্ত্র-পরজীবী।

ফিতা কৃমির মতো অ্যাকান্থসেফালা-এর জীবন-চক্রের কোন অবস্থায় পারিপাক-নালী নাই। এদের লম্বাটে দেহে 'প্রোবসিস' ও গলা রয়েছে (চিত্র-৫)। প্রোবসিস কাঁটাযুক্ত ও গলা কাঁটাবিহীন। দেহত্বকে লম্বা ও তির্যক বদ্ধ বাহিকা বা 'ভেসেল' রয়েছে যার সাহায্যে এই পরজীবীগুলো পোষক দেহ থেকে খাদ্যরস শুষে নেয়। এদের স্ত্রী ও পুরুষ আলাদা হয় এবং সব সময় পুরুষটি স্ত্রী প্রাণীটি থেকে আকারে ছোট হয়ে থাকে। পুরুষ প্রাণীর ২টি শুক্রাশয় রয়েছে।

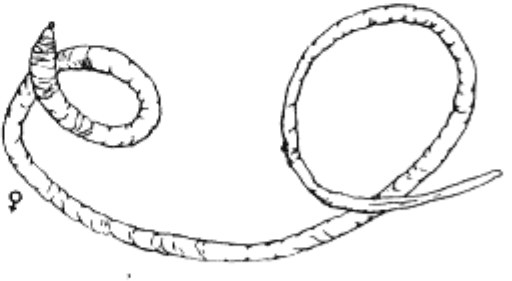

চিত্র-৫ অ্যাকান্থসেফালীয় পরজীবী।

দেহ-বর্ধনের প্রথম দিকে স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বাশয় থাকে এবং পরবর্তীকালে তা থেকে ডিম্বাণু তৈরি হয়। এদের দেহের শেষপ্রান্তে 'জরায়ুজ চোঙ্গ' বা 'ইউটেরান-বেল' নামক একটি জটিল অঙ্গ রয়েছে। এর প্রশস্ত প্রান্ত ডিম-সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করে

Banglainternet.com

এবং সেখানে পূর্ণ ডিম থেকে মাকু আকৃতির পরিপক্ক ভ্রূণ–'অ্যাকান্থোর' বেরিয়ে আসে। এদের জীবন–চক্রের মধ্য পোষক সাধারণত সন্ধিপদী প্রাণী। অ্যাকান্থোর পর্যায়ে এগুলো মধ্য–পোষক দ্বারা বাহিত হয়ে প্রধান পোষক–দেহে প্রবেশ করে। সেখানে এই অপরিণত পর্যায়টি প্রিঅ্যাকন্থেলা, অ্যাকন্থেলা ও সিস্টাকান্থ ধাপের মধ্য দিয়ে পরিণত পরজীবী প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়।

পর্ব অ্যাক্যান্থসেফালার শ্রেণীবিন্যাসগত মতবিরোধ রয়েছে। তবে এখানে ২টি শ্রেণী, ৪টি বর্গ, ১২টির মতো পরিবার ও ৬০টির মতো 'গণ'–এর অবস্থান সম্পর্কে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মত পোষণ করেন। শ্রেণীবিন্যাসগত পার্থক্য থাকলেও আকার–আচরণ ও জীবন–চক্রের দিক দিয়ে এগুলো বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই কাঁটা মাথাওয়ালা কৃমিগুলো যথেষ্ট বিস্তৃত হলেও মানুষে পরজীবীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। এরমধ্যে 'মোনিলিফর্মিস' গণের প্রজাতি উল্লেখযোগ্য। 'মোনিলিফর্মিস' গণের প্রজাতি ঘরের সাধারণ ইঁদুরে সংক্রমিত হলেও তা মানুষকে আক্রমণ করে থাকে। তবে এই পরজীবীর মানুষে সংক্রমণের সঠিক পথ জানা নেই। এদের দেহ গোলাকার ও অঙ্গুরীয় বলে দেখতে অনেকটা ফিতা কৃমির মতো। এগুলোর স্ত্রী–দেহ লম্বায় ৪ থেকে ১২ ইঞ্চি এবং পুরুষ–দেহ গড়ে ৪ থেকে ৭ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এদের জীবন–চক্রের 'অ্যাকান্থেলা'ও 'সিস্টাকান্থ' পর্যায় রয়েছে।

এই পরজীবীগুলো পোষক দেহে স্থানীয় ক্ষত থেকে শুরু করে নানামুখী ক্ষতিকর সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। সংক্রমণ স্থান ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দ্বিতীয় বারের মতো আক্রান্ত হয়। তখন রোগ জটিল হয়ে পড়তে দেখা যায়। কখনো কখনো এই পরজীবীর আক্রমণে পোষক অন্ত্র ছিদ্র হয়ে গেলে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ফিতা কৃমি বা অন্যান্য কৃমির সঙ্গে খাদ্য প্রতিযোগিতায় এই জাতীয় পরজীবীগুলো পেরে ওঠে না। সহজভাবে এটা ধরে নিতে পারি যে, আমরা কোন না কোন কৃমিজাত বা সম্প্রদায় দ্বারা আক্রান্ত। সেই সুবাদে আমাদের অ্যাকান্থসেফালীয় পরজীবীর আক্রমণের ঝুঁকিও যথেষ্ট কমে যায়।

নেমাথহেলমিন্থস (নেমাটোডা বা সূতা কৃমি)

পরিচিতির দিক দিয়ে পর্ব নেমাথহেলমিন্থস–এর অবস্থান পর্ব প্লাটিহেলমিন্থস–এর মতো সহজ বা পরিচ্ছন্ন নয়। পুরানো আমল থেকে এই পর্বটিতে শ্রেণী নেমাটোডা সব সময় সংযুক্ত থাকলেও এতে নানা ধরনের অন্যান্য প্রাণীদলের সমাবেশ ছিল। সেই সমাবেশে শুধু যে অ্যাকান্থসেফালাই বর্তমান ছিল তাই নয় বরং সেখানে গ্রেগারিন জাতীয় এককোষী প্রাণীদলও উপস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে এই পর্বটি অ্যাসেলমিন্থস নামে পরিচিত হয়ে উঠে। অ্যাসেলমিন্থস–এ ৬টি শ্রেণী রয়েছে। এসবের অধিকাংশ সদস্য কেবল বিশেষজ্ঞের কাছে কমবেশি পরিচিত। জনসাধারণের কাছে তা প্রায়

BanglaInternet.com

অপরিচিত রয়ে গেছে। অথচ এদের যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে, নেমাটোড শ্রেণীর সদস্যগুলো আমাদের জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উল্লেখের দাবীদার। আমাদের জানা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জল ও স্থলের যে কোন খণ্ডাংশে এ দলের প্রাণীগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মোটামুটি একটা সহজসাধ্য ব্যাপার। অর্থাৎ যে কোন পরিবেশে এই প্রাণীগুলো নিজেদের সইয়ে-সামলিয়ে নিতে সক্ষম। ঢালাও মন্তব্যে অত্যুক্তি করা হবে না যে উদ্ভিদজগতের বেশিরভাগ গাছগাছালি এবং সম্ভবত পৃথিবীর সকল প্রাজাতির মেরুদন্ডী প্রাণী নেমাটোড সংক্রমণের শিকারে পরিণত হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির এক হিসেবে দেখা গেছে যে, বিশ্বের ২২০ কোটি জনগোষ্ঠীর ২০০ কোটি মানুষ নেমাটোড দ্বারা আক্রান্ত। এই পরিসংখ্যানে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নেমাটোডের জীবন-ধারা ও অভিযোজন ক্ষমতা কত ব্যাপক। কত বিচিত্র গতিময় এদের জীবন-নৈপুণ্য।

পঞ্চাশটিরও বেশি নেমাটোড প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটালেও কেবল ১২টির মতো প্রজাতি মানুষে কার্যকরভাবে পরজীবী। এবং তা মানুষের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি থেকে, রোগ-শোক-বালাই এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণ নেমাটোড লম্বা, গোলাকার চোঙের মতো হয়ে থাকে। এদের মাথা ও লেজের দিকটা ক্রমান্বয়ে সরু এবং তা শক্ত, স্বচ্ছ বা আধা-স্বচ্ছ প্রতিরোধ্য দেহত্বক দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই শক্ত দেহত্বক কাইটিনযুক্ত নয়, যা সন্ধীপদী বা আথ্রোপোডীয় প্রাণীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। নেমোটোডের ডিমে আবার কাইটিনের উপস্থিতি দেখা যায়। মুক্ত প্রকৃতিতে এই ডিমগুলোর নিরাপদ সংরক্ষণের কারণেই এমনটা হয়ে থাকে বলে ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত। এদের পরিপাক নালী সরল ধরনের যার শুরু মুখ থেকে এবং শেষ হয় পরজীবী প্রাণীর মলদ্বারে। নেমাটোড প্রাণীগুলোর দেহ-গহ্বর তরল রসে পূর্ণ। তবে অন্যান্য জীবদলের সদস্যের মতো এদের অভ্যন্তরীণ দেহত্বক ইপিথেলিয়াম-এ সারিবদ্ধ নয়। এগুলোর স্ত্রী ও পুরুষ জাত আলাদা আলাদা। রেচন-রন্ধ্র সাধারণত প্রাণির লেজের দিকে না হয়ে তুলনামূলকভাবে সামনের (মধ্য অঙ্কীয়) দিকে হয়ে থাকে। তবে তা জাত বিশেষে লম্বালম্বিভাবে পার্শ্বীয় অবস্থানেও হতে দেখা যায়। এদের জীবন-চক্রের ভ্রূণোত্তর বর্ধন সরাসরি ও সহজ ধরনের। কোন কোন সদস্যে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে পরজীবী প্রাণীগুলোর ভ্রূণোত্তর পরিপূর্ণতা লাভের জন্য দু'টি পোষক দেহের প্রয়োজন হয়।

সাধারণভাবে যদি আমরা ধরে নেই যে, পৃথিবীর তাবৎ মেরুদন্ডী প্রাণিকূল এই নেমাটোড জাতীয় পরজীবীর শিকার হয়, তবে এর আনুষঙ্গিক ভৌগলিক বিস্তৃতি-পরিবেশ, আবহাওয়া-তাপমাত্রা পরজীবীর আনুকূল্য ও প্রতিকূলতা ইত্যাদি বিবেচনায় এটা সহজে অনুমান করা যায় যে, উপরোক্ত সাদাসিদে বর্ণনার বিপরীতে অসংখ্য দেহজ রকমফের, ব্যতিক্রমধর্মী অভিযোজন দৃষ্টান্ত রয়েছে। রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দেহাকৃতি, আচার-আচরণের নেমাটোড— তা মুক্তজীবী থেকে পরজীবী উভয়

BanglaInternet.com

ক্ষেত্রেই। সেখানে মুখাঙ্গ থেকে নিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বেলায় প্রযোজ্য। প্রযোজ্য আচার-ব্যবহারের বেলায়ও।

শ্রেণীবিন্যাস ঃ পর্ব— অ্যাসেলমিন্থিসের শ্রেণী নেমাটোডার বিভক্তির ব্যাপারে বেশ কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে। সেসব মেনে নিয়ে এই শ্রেণীকে দু'টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১। উপশ্রেণীঃ ফেসমিডিয়া

২। উপশ্রেণী ঃ অ্যাফেসমিডিয়া

উপশ্রেণী ফেসমিডিয়াতে বেশিসংখ্যক মেটে নেমাটোড (সয়েল নেমাটোড) রয়েছে এবং এর অনেক প্রজাতি কীটপতঙ্গ ও মেরুদন্ডী প্রাণীতে পরজীবী। পক্ষান্তরে অ্যাফেসমিডিয়াতে বিশেষ করে জলজ প্রজাতিগুলো অবস্থিত। এখানে মুক্ত ও পরজীবী— উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রাণীগোষ্ঠী রয়েছে। এই উপশ্রেণী দু'টোর বর্গ পরিচিতির কিছু অসামঞ্জস্যতা থাকায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণে এ বিষয়ের শ্রেণীবিন্যাসবিদগণ বর্গ নাম উপেক্ষা করে উপবর্গ বর্ণনায় আগ্রহী হয়েছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কাজেই উপশ্রেণী ফেসমিডিয়ার উপবর্গের মধ্যে র‍্যাবডিটাটা, অ্যাসকেরিডাটা, স্টনজাইলাটা, স্পিরুরাটা ও কেমাল্লানাটা-এর নাম করা যায়। অন্যদিকে উপশ্রেণী অ্যাফেসমিডিয়াতে ২টি উপবর্গ রয়েছে— ট্রাইচুরাটা ও ডায়াকটোফাইমাটা। এসব উপবর্গের মধ্যে বেশ কিছু অতি-পরিবার, পরিবার ও এদের বিভিন্ন গণ ও প্রজাতি রয়েছে— যেগুলোর যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

হুক ওয়ার্ম ঃ নেমাটোড দলের প্রাণীগুলো কম পরিচিত বা অপরিচিত হলেও স্টনজাইলাটা উপবর্গের প্রধান পরজীবী সদস্য হুক ওয়ার্মগুলো সে অর্থে অজানা, অচেনা নয় বরং আমাদের অজ-পাড়াগাঁয়ের মানুষের মুখেও এর নাম শোনা যায়। কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও এই পরিচিতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে, এর মারাত্মক সংক্রমণের জন্যই এমনটা হয়েছে। এর আক্রমণ ব্যাপক ও যথেষ্ট ক্ষতিকর। আমাদের গ্রামে-গঞ্জে, এমন কি সারা দেশে এই পরজীবী প্রাণীটির দৌরাত্ম্য রয়েছে। এটির সংক্রমণ আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

বিশ্ব হেলমিন্থিস সংক্রমণের ইতিহাসেও হুক ওয়ার্ম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে উন্নত বিশ্ব এই সংক্রমণ রোধের যে চেষ্টা চালিয়ে গেছে তাতে তারা তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। হুক ওয়ার্ম সংক্রমণের বিশিষ্টতা হলো— এই রোগ অন্যান্য আক্রমণের মতো তাৎক্ষণিকভাবে তেমন মারাত্মক নয়। এর ক্ষয়ক্ষতি খুব ধীরগতিতে হয়। এগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, বছরের পর বছর ধরে পোষক মানুষের ক্ষতি করে যায়। এই ক্ষুদ্র পরজীবী প্রাণীগুলো মানুষের জীবনী রসদে ভাগ বসিয়ে যেতে থাকে। ফলে

BanglaInternet.com

ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী হয়ে পড়ে দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন। মূলত রোগী তখন রক্তশূন্যতায় ভোগে।

এই পরজীবী প্রাণীগুলোর পুরুষ জননরন্ধ্র ঘিরে যে 'বুর্সা' নামক অদ্ভুত আকৃতি রয়েছে তা দিয়ে এগুলোকে সহজে সনাক্ত করা যায়। এই 'বুর্সা' দেহত্বকের পরিবর্ধিত ছাতার মতো একটি অঙ্গ। এদের আকৃতিগত ভিন্নতা রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন, (ফুসফুস ওয়ার্ম) তা ক্ষুদ্র— এমনকি অনুপস্থিতও হতে পারে। এদের অন্ননালী চিড়িতন বা চোঙ্গাকৃতির— যাতে স্পষ্ট ঠোঁট নেই। মুখ সাধারণ রন্ধ্রের মতো (চিত্র-৬)। এদের ডিম রঙবিহীন এবং স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা। ডিম দেয়ার সময় এর কিছুটা খন্ডায়ন বা ভ্রূণায়ন হয়ে যায়। এদের মূককীটীয় পর্যায় মুক্তজীবী। এর শূককীট প্রধানত চামড়া ভেদ করে পোষক দেহে পৌঁছে যায়। অনেক সময় এই প্রাণীগুলো পানি বা শাক-সব্জির সঙ্গে পোষকের পেটে চলে যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন, ফুসফুস ওয়ার্ম) এদের মধ্য-পোষক বা স্থানান্তর পোষকও থাকে। এখানে সংক্রমণ সরাসরি হয় না।

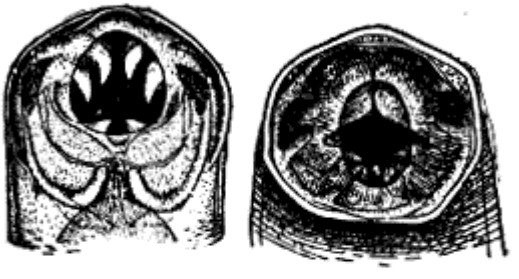

চিত্র-৬ হুক-ওয়ার্মের মুখাঙ্গ।

দু'টি প্রজাতির হুক ওয়ার্ম মানুষে পরজীবী। সেগুলো হচ্ছেঃ 'অ্যাংকাইলোস্টোমা ডিউডেনেলী' এবং 'নেকাটর আমেরিকানাস'। সাধারণ আকৃতি থেকে নিয়ে জীবন-ইতিহাস এমনকি আচার-আচরণের খুটিনাটিতেও এদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে 'অ্যাংকাইলোস্টোমা' পোষক দেহের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর এবং তা সহজে দেহ থেকে দূর করা যায় না। সাধারণ ওয়ার্ম বিনষ্টকারী ওষুধে এদেরকে নির্মূল করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

'অ্যাংকাইলোস্টোমা'-এর প্রজাতিগুলোর বিশ্বজোড়া বিস্তৃতি থাকলেও ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াতে এগুলোর প্রকোপ বেশি। 'অ্যাংকাইলোস্টোমা ডিউডেনেলী' মানুষের পরজীবী হলেও তা শূকরে দেখা গেছে। এমন কি কুকুর, বিড়াল ও বানরে তা প্রতিপালিত হয়।

'নেকাটর আমেরিকানাস' প্রথমত গ্রীষ্মমন্ডলীয় প্রজাতি। তবে বর্তমানে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। এটি আমেরিকান হুক ওয়ার্ম নামে পরিচিত। কেননা, তা প্রথম এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং তা উৎসগতভাবে আফ্রিকীয়। 'নেকাটর' আকারে 'অ্যাংকাইলোস্টোমা' থেকে ছোট। এছাড়াও মাথার আকৃতিগত তফাতের জন্য এ দু'টি প্রজাতিকে সহজে চেনা যায়।

BanglaInternet.com

উভয় গণের হুক ওয়ার্মগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে এবং সেখানে থেকে এগুলো শ্লেষ্মা-ঝিল্লি, রক্ত ও কোষকলার রস শুষে নেয়। নেকাটর প্রজাতি দিনপ্রতি ৫ থেকে ১০ হাজার ডিম দেয়। অন্যদিকে 'অ্যাংকাইলোস্টোমা'-এর ডিম দেয়ার হার নেকাটর-এর দ্বিগুণ। ডিম দেয়ার এই অস্বাভাবিক সংখ্যায় প্রথমত এটাই মনে হয় যে, এদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পজন্ম। মুক্তজীবী শূককীটগুলো ব্যাকটেরিয়া ও মলের অবশিষ্টাংশ খেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ে। শূককীট চরম আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে না। এগুলো সাধারণত ৭০-৮৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটে সহজে বাড়তে পারে এবং মাটির উপরকার আধা ইঞ্চির মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। কেননা, এই অবস্থানে এরা সহজে মানুষের পায়ের সংস্পর্শে আসে। উপযুক্ত পোষকের নাসিকা ও রক্তবহতন্ত্র পেয়ে গেলে এরা দ্রুত বংশবিস্তার করতে শুরু করে। পরিণত হুক ওয়ার্ম মানুষের অন্ত্রে ৫ বছরের বেশি বাঁচে। এক পরীক্ষণে 'নেকাটর'-কে মানবদেহে ১৫ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে দেখা গেছে। তবে এদের স্বাভাবিক আয়ু এর চেয়ে বেশ কম।

কিছু হুক ওয়ার্ম প্রজাতি কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তুকে আক্রমণ করে থাকে।

'অ্যাসকেরিস' বা সাধারণ বড় কৃমি

নিঃসন্দেহে প্রাণী হিসেবে মানুষের উদ্ভবের সময় থেকে এই 'অ্যাসকেরিস' প্রজাতির পরজীবীগুলো আমাদের নিত্য সহচর। একান্ত ঘনিষ্ঠ এক সহাবস্থানে টিকে রয়েছে। এর সংক্রমণের ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে— যেদিন থেকে আদি মানুষ বন্য জীবজন্তুকে (শূকর, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি) গৃহপালিত করার প্রয়াস নিয়েছে— ততদিন থেকেই এই পরজীবীগুলো থেকে খোদ্ আমাদের অন্ত্রে বাসা করে নেয়ার সুযোগ পেয়েছে। সক্ষম হয়েছে। এগুলো আকারে বেশ বড় বলে সেসময় থেকে তা সনাক্তকৃতও হয়েছিল। কিন্তু এর জীবন-চক্রের নানান খুটিনাটি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অজানা ছিল। এরপর ১৯৩০ সাল নাগাদ এগুলোর সংক্রমণ ধারার ধ্যান-ধারণা, নানা তথ্য-তত্ত্ব, নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সমৃদ্ধ হয়। এর প্রধান কারণ, হুক ওয়ার্ম সংক্রমণের ভয়াবহতায় মানুষ যতটা সচেতন ছিল— 'অ্যাসকেরিসের' ব্যাপারে তত ছিল না।

মানুষের পরজীবী 'অ্যাসকেরিস' গণের সবচেয়ে বড় এবং পরিচিত প্রজাতি হলো— 'অ্যাসকেরিস লুব্রিকয়িডেস'। এগুলো দৈর্ঘ্যে ৮ ইঞ্চি থেকে ১ ফুটেরও বেশি লম্বা হয়। স্ত্রী ও পুরুষ কৃমি দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান সমান হলেও প্রস্থে এগুলো সরু এবং এদের লেজের শেষ প্রান্ত বড়শি আকারের। অন্যদিকে স্ত্রীর বেলায় তা ভোতা। এদের

Banglainternet.com

চিত্র-৭ 'অ্যাসকেরিস'-এর বিস্তৃতি (ঘন অংশ ১০°-এর ওপর এবং হালকা অংশ ১০°-এর নিচে)

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথার দিকটা সরু। সারা বিশ্বে এদের কমবেশি বিস্তৃতি রয়েছে (চিত্র-৭)।

এই জাতের কৃমির মুখাংশে ৩টি ঠোঁট এবং তাতে সূক্ষ্ম পিড়কা রয়েছে। এদের অন্ননালী গোলাকার এবং অন্ত্র চ্যাপ্টা ফিতার মতো। সাধারণত এগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাস করে। সাধারণভাবে এদের পোষক দেহ থেকে আধাজীর্ণ খাদ্যরস শুষে নেয়ার কথা হলেও এরা শ্লেষ্মা-ঝিল্লি কামড়িয়ে রক্ত ও কোষকলার রস টেনে নেয়। পরিণত স্ত্রী ওয়ার্মের ডিমের সংখ্যা অস্বাভাবিক রকমের বেশি। তা প্রায় পৌনে ২ কোটির মতো। সেক্ষেত্রে প্রতিটি স্ত্রী-কৃমির প্রতিগ্রাম মলে ২ হাজারেরও বেশি ডিম থাকে। এই হারে ডিম নির্গত হতে থাকলে একটি স্ত্রী কৃমি প্রতিদিন ২ লক্ষের মতো ডিম দেয়।

উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আবহাওয়ায় ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে এই ডিম ভ্রূণে পরিণত হয়। তবে সংক্রমণ পর্যায়ে যায় না, যতক্ষণ না তা দ্বিতীয়-পর্যায়িক শূককীটে পরিণত হয়। সাধারণত ডিম খাদ্য-মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করলে তা কার্যকর শূককীটরূপে বেড়ে ওঠে। ছোট অবস্থায় থাকাকালীন এই শূককীটগুলো অনেক সময় রক্ত-সংবহনতন্ত্রের দ্বারা বাহিত হয়ে যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসে বিচরণ করতে দেখা যায়। এই বিচরণ ক্ষেত্র শ্বাসনালী, গলা ও অন্ননালীতেও প্রসারিত হয়। ছোট ছোট 'অ্যাসকেরিস'-গুলো মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে ২ থেকে ২.৫ মাসের মধ্যে পরিণত অবস্থায় পৌঁছে যায়। এদের স্বাভাবিক আয়ু ৯ থেকে ১২ মাস।

BanglaInternet.com

পোষক দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদিতে 'অ্যাসকেরিস' চলাচলের ফলে সেই সকল অঙ্গে যে রক্তক্ষরণ ও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ধারার সংক্রমণ হয় তাতে রোগী জ্বর, নিউমোনিয়া, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক আক্রমণের শিকার হয়। এছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিণত কৃমির অবস্থানে অনেক সময় পোষক মানুষের বমি, উদরাময় ও সামান্য জ্বর দেখা দিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পোষক অন্ত্রে ১ থেকে ৫ হাজার কৃমি পাওয়া গেছে এবং কেবল শতাধিক কৃমিই পরিপাকনালী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে পারে (চিত্র-৮)। সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারলে রোগীর মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হয় না। এই কৃমি সময় সময় 'ভার্মিফর্ম অ্যাপিনডিক্স'-এর নালীতে ঢুকে 'অ্যাপেন্ডিসাইটিস'-এর যে যন্ত্রাদায়ক সংক্রমণ ঘটায় তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এগুলো পরিপাকতন্ত্রে যে বিষাক্ত নিঃসরণ ঘটায় তা পোষক রোগীর স্নায়বিক দৌর্বল্য থেকে অজ্ঞানাবস্থা পর্যন্ত হয়ে যায়। এছাড়া অন্ত্রে এদের উপস্থিতি সার্বিকভাবে শারীরবৃত্তে নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

চিত্র-৮ 'অ্যাসকেরিস' দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্র অবরুদ্ধ।

'এন্টারোবিয়াস' গণের ক্ষুদ্র পরজীবীগুলো প্রধানত পোষকের সিকাম ও কোলনে বসবাস করে। এগুলো যে শুধু মেরুদন্ডী প্রাণীকে আক্রান্ত করে তাই নয়— কোন কোন ক্ষেত্রে তা কীটপতঙ্গে সংক্রমিত হতে দেখা যায়। এই গণের উল্লেখযোগ্য প্রজাতি 'এন্টারোবিয়াস ভার্মিকুলারিস' মানুষে পরজীবী। সারা পৃথিবীতে এদের বিস্তৃতি সাধারণভাবে এদেরকে পিনওয়ার্ম, সিটওয়ার্ম ও থ্রেডওয়ার্ম নামে চিহ্নিত করা হয়। এগুলো সাদাটে রঙের এবং মলত্যাগের পর তাতে নড়াচড়া করতে দেখা যায়। এগুলো রাতের বেলায় পায়ুপথের বাইরে এসে ডিম দিয়ে যায়। এদের এই বিচরণ পোষকের পক্ষে যথেষ্ট বিরক্তিকর। সংক্রমণ প্রধানত বাতাস ও হাতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এদের গড় আয়ু এক থেকে দেড় মাসের মতো।

'স্ট্রনজাইলয়িডেস স্টারকোরালিস' : এই প্রজাতিটি নেমাটোড পরজীবীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সদস্য। এগুলো মূলত গ্রীষ্ম ও আধা গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়ায় বিস্তার লাভ করে যা অনেকটা হুক ওয়ার্মের মতো। এই প্রজাতির স্ত্রী সদস্যগুলো শুধু পরজীবী। পুরুষগুলো মুক্তজীবী।

BanglaInternet.com

পরিণত স্ত্রী পরজীবী অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি ছিদ্র করে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে।

তা পোষক দেহের পাকস্থলী থেকে মলাশয়ের যে কোন স্থানে হতে পারে। তবে ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগ এদের প্রিয় বাসস্থান। বিরল ক্ষেত্রে তা শ্বাসনালীতেও দেখা যায়। এগুলো শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে ডিম দেয় ও শূককীট রূপে বেড় ওঠে। এদের ডিম দেয়ার হার খুব বেশি নয়। দিন প্রতি ৫০টির মতো। শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতে বাড়তে থাকা শূককীটগুলো সেখান থেকে অন্ত্রে বিস্তার লাভ করে থাকে। এদের শূককীট আকৃতির দিক দিয়ে অনেকটা হুক ওয়ার্ম শূককীটের মতো। তবে এদের মুখগহ্বর খাট। আক্রান্ত রোগীর মলে এদের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর সংক্রমণের ধরনও হুক ওয়ার্মের মতো। ত্বক ভেদ করে এরা পোষক দেহে প্রবেশ করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এগুলো মারা যায় বলে এদের সংক্রমণ পোষক দেহের জন্য তেমন মারাত্মক নয়।

'উচেরেরিয়া (=ফিলারিয়া) ব্যাংক্রফটি' : এটি মানুষের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরজীবী। সাধারণত এই প্রাণীটি লম্বা গ্রীষ্মকাল এবং বেশি আর্দ্রতায় সহজে বিস্তার লাভ করে। তবে এটা দেখা গেছে, আরব, ভারত উপমহাদেশ, মালয়, ফরমোসা, চীন, কোরিয়া এবং জাপানের উপকূলীয় অঞ্চলে এগুলোর প্রকোপ অধিক। মধ্য আফ্রিকায় এদের তেমন সংক্রমণ নেই, কিন্তু ভূমধ্যসাগর ও এই মহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় এগুলো যথেষ্ট দেখা যায়। বাহক মানুষের দ্বারা এগুলো পশ্চিম গোলার্ধেও ছড়িয়েছিল। কোন কোন এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে এই সংক্রমণের হার শতকরা ৮০ ভাগেরও ওপরে। তবে বর্তমানে উন্নত বিশ্বে এদের সংক্রমণ অনেকাংশে কমে এসেছে।

এই পরিণত প্রাণীটি লসিকা গ্রন্থি বা নালীতে বসবাস করে। স্ত্রী পরজীবীটি ২.৫ থেকে প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা ও অত্যন্ত সরু হয়ে থাকে। এদের মাথা সরু ও শেষের দিকটা সামান্য মোটা। স্ত্রী 'উচেরেরিয়া' ক্ষুদ্র ভ্রূণ বা পাতলা ঝিল্লি/পর্দায় ঢাকা মাইক্রোফিলারিয়া প্রসব করে। এগুলোকে প্রধানত রাত ১০টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রান্ত শাখা-প্রশাখায় দেখা যায়। সক্রিয় থাকার এই বিচিত্র সময়সীমার কারণ খুঁজতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, নিশাচর মশার দ্বারা রাত-বিরাতে এগুলো বিস্তারের সুবিধার্থেই এমনটা করে থাকে। তবে এই কারণ ছাড়াও এর আরো সম্ভাব্য বিশ্লেষণ রয়েছে।

এই পরজীবীর মধ্য-পোষক মশা। ম্যালেরিয়া বা পীত-জ্বর সংক্রমণকারী প্রাণীগুলোর যেমন নির্দিষ্ট বাহক/মধ্য-পোষক প্রজাতি বা গণের মশা রয়েছে— 'উচেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি'-এর বেলায় তেমনটি হয় না। এলাকাভিত্তিক প্রায় সকল ধরনের মশা (যথা, 'কিউলেক্স', 'এইডিস', 'অ্যানোফিলিস' ইত্যাদি) এদের বাহক। এই পরজীবী ভ্রূণগুলো মশার পাকস্থলীর চামড়া ভেদ করে মাংসপেশীতে পৌঁছায়। সেখানে এগুলো বেড়ে সংক্রমণ-পর্যায়ে যায়। এই পরজীবীগুলো ৮০° ফারেনহাইট ও ৯০% আর্দ্রতায় খুব ভাল বাড়ে। এরা যখন সংক্রমণ পর্যায়ে থাকে তখন সেই মশা মানুষকে কামড়ালে পোষক দেহ এই রোগে আক্রান্ত হয়। পরিণত 'উচেরেরিয়া'

BanglaInternet.com

কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ বৎসর কাল বাঁচে। এই সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীর লসিকা নালী রুদ্ধ হয়ে শেষমেষ পোষক দেহে যে রোগসৃষ্টি হয়— তা গোঁদ বা 'অ্যালিফেনথিয়াসিস' নামে পরিচিতি (চিত্র-৯)। 'উচেরেরিয়া' বা 'ফিলেরীয়' সংক্রমণের এটাই শেষ দশা। অবরুদ্ধ কোষকলার সংক্রমণ বিক্রিয়ার ফলেই এমনটা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই রোগাক্রান্ত ব্যাক্তির অন্ডকোষ বা পায়ের ওজন ২০০ পাউন্ড পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। এছাড়া এ রোগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বন্ধ্যা থেকে শুরু করে মূত্রথলি, বৃক্ক, অন্ত্র — অনেক অঙ্গেরই রোগ দেখা দিতে পারে। সাধারণত এই রোগের বহিঃপ্রকাশ খুব ধীরে ধীরে হয়। কখনো কখনো তা ১০-১৫ বছরও লেগে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে তা দ্রুতও হয়। যেমন, সোমা ও দক্ষিণ পেসিফিক দ্বীপ -পুঞ্জে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার সৈন্যদের যে গোঁদরোগ দেখা দিয়েছিল— এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সাড়ে ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যেই আমাদের দেশে এই রোগের বিস্তৃতি কম নয়। প্রাথমিক রক্ত-পরীক্ষায় সহজে এই রোগ সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। যেহেতু বিভিন্ন জাতের মশাকে এই রোগের একমাত্র মধ্য-পোষক হিসেবে ধরা হয়—সেই হেতু মশা নিয়ন্ত্রণ করলেই এই রোগ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে — এমনটা ভাবা যুক্তিসঙ্গত।

চিত্র-৯ মানুষের পায়ের 'এলিফেনথিয়াসিস' রোগ।

এই পরজীবীর আর একটি সহোদর প্রজাতি হলোঃ 'উচেরেরিয়া মালায়ি'। এগুলোর সংক্রমণ ভারত উপমহাদেশ, মালয় এবং কেনীয় উপকূলে যথেষ্ট দেখা যায়।

লোয়া লোয়া ঃ আফ্রিকীয় চক্ষু-ওয়ার্ম মানুষের চক্ষু রোগের এই পরজীবীগুলো পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় বিস্তৃত। এগুলো দেখতে অনেকটা শল্যচিকিৎসার কেটগাটের মতো। পরিণত ওয়ার্ম লম্বায় ১ ইঞ্চির ওপরে। স্ত্রী পরজীবীটি দৈর্ঘ্যে সামান্য বড়। এদের সাধারণ দেহাকৃতি অনেকটা 'উচেরেরিয়া' এবং 'ব্রুফটির'-এর মতো। শুধু এদের দেহাবরণে ছোট ছোট উঠতি দানা রয়েছে। লোয়া লোয়া আবরণে আবৃত ভ্রূণ প্রসব করে— যা পোষক দেহের রক্তধারা পেয়ে গেলে সংক্রমণ কাজ শুরু করে। এগুলো দিনের বেলায় রক্ত সংবহনতন্ত্রে চলাচল করে, রাতের বেলায় নয়। এদের মধ্য-পোষক 'ক্রাইসপ্স' জাতীয় মাছি। এগুলো সাধারণভাবে 'আমের মাছি' নামে পরিচিত। অপরিণত লোয়া লোয়া মাছির উদরে

BanglaInternet.com

বেড়ে উঠে এবং সেখান থেকে সংক্রামক পর্যায়ে যায়। এ অবস্থায় মাছি পোষক দেহের ত্বকের সংস্পর্শে এসে গেলে তা রক্তবাহিত হয়ে সংক্রমণ কাজ শুরু করে দেয়।

লোয়া সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে আক্রান্ত অঙ্গে ব্যথাহীন ফোলা লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে চুলকানিও হতে পারে। এই উপসর্গ একবার দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেতে পারে। কিছুদিন পরে আবার সেসব লক্ষণ ফিরে আসে। এই রোগ-লক্ষণ পরজীবীর বিপাকীয় বস্তুর এলার্জীয় বিক্রিয়ারই ফল বলে জানা গেছে। এই সংক্রমণের অপরিণত পর্যায়ে মাইক্রোফিলেরিয়াই যখন মগজ বা প্রধান স্নায়ু-রজ্জুকে আক্রমণ করে তখন তা হয়ে পড়ে অত্যন্ত মারাত্মক। এর সঙ্গে স্নায়বিক ভাইরাসেরও সংক্রমণ ঘটার সুযোগ হয়। এ রোগ সংক্রমণে চোখের যে প্রদাহ হয় তা অনেক ক্ষেত্রে আশঙ্কাজনক হয়ে পড়তে পারে (চিত্র-১০)। সময়োচিত চিকিৎসাই এই ভয়াবহ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

চিত্র-১০ লোয়া-লোয়া আক্রান্ত মানুষের চোখ।

গিনি ওয়ার্ম ঃ 'ড্রাকুনকুলাস মেডিনেনসিস' ঃ সুদূর অতীতকাল থেকে গিনি-ওয়ার্ম সংক্রমণে সময় সময় মানব সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। পৌরাণিক আমল থেকে এই পরজীবীটির আক্রমণে ভারত উপমহাদেশ, আরব, ইষ্ট ইণ্ডিজ, মিশর ও মধ্য আফ্রিকার অধিবাসীরা নিস্তার পায়নি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের এক হিসাবে দেখা গেছে যে, পৃথিবীতে গিনি-ওয়ার্ম সংক্রমণজনিত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটির মতো। ভারত ও আমাদের দেশের কোন কোন এলাকার প্রায় ২৫% লোক এ রোগে আক্রান্ত বলে মনে করা হয়।

পরিণত 'ড্রাকুনকুলাস' প্রজাতি দৈর্ঘ্যে ১ ইঞ্চির ওপরে। স্ত্রী ও পুরুষের সাধারণ পিড়কাযুক্ত মুখ থাকে এবং অন্ননালী যথেষ্ট লম্বা। গিনি ওয়ার্ম সহজে চামড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিল-ঝিল ও নদীনালাতে যারা খোলা হাতে কাজ করে তারা সহজে এই সংক্রমণের শিকার হয়। এদের মধ্য-পোষক 'সাইক্লপস' নামের চিংড়ি জাতের প্রাণী। এছাড়া, এদের ভ্রূণ মুক্তজীবী হয়েও পানিতে ভেসে বেড়ায়। তবে তা বেশিক্ষণের জন্য নয়। এই ওয়ার্ম পোষক হাত বা পায়ের সংস্পর্শে এলে সহজে এর নিচের ত্বক ছিদ্র করে পোষক দেহে অনুপ্রবেশ করে। এই ওয়ার্ম ১১ থেকে ১২ মাসের মধ্যে পরিণত সংক্রামক প্রাণী হিসেবে বেড়ে ওঠে। এই পরজীবীগুলো যে বিষাক্ত রস ত্যাগ করে তাই এলাকা ভিত্তিক চুলকানি ও চর্মরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে ধীরে ধীরে তা-ই স্থায়ী ক্ষত বা আলসারে পরিণত

banglainternet.com

হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যের এক জরিপে দেখা গেছে যে, ৪ বছরের নিচের শিশুরা এই রোগ থেকে মুক্ত কিন্তু ৩০ থেকে ৩৫ বছরে পৌঁছতে পৌঁছতে এদের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ এ সংক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। সেসব ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ জনের পায়ে আলসার পরিলক্ষিত হয়। এই সংক্রমণ প্রতিরোধের সহজতম উপায় হল পানিকে এর মধ্য-পোষক 'সাইক্লপ'-মুক্ত করা।

Banglainternet.com

আর্থ্রোপোডাঃ ভুবনজয়ী সর্ববৃহত প্রানিগোষ্ঠী

সাধারণভাবে আমরা দেখি, সারা বিশ্ব আমাদের পদানত। আপাতদৃষ্টে ব্যাপারটা হয়ত তাই। আমরা ভুবনজয়ী। সাগরের অথৈ অতল থেকে সৌরমন্ডলের দূরদূরান্তের নানা কক্ষপথে আমাদের অবাধ বিচরণ। তা কখনো বাস্তবে, কখনো পরিকল্পনায়, কখনো স্বপ্নচারণে। আমরা চষে বেড়াই গহীন প্রকৃতির দুরূহ রহস্য সন্ধানে। ঘুরে বেড়াই সীমাহীন মরুভূমিতে, পাহাড়-পর্বতের শ্বেতশুভ্র শৈল-শিখরে। অন্যদিকে পরমাণু জগতের মৌলিক কণার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকার-প্রকারের অস্তিত্বেও আমাদের বিচরণ। তা হলে আমরা কোথায় নেই? আছি সব জায়গাতেই। এবং জানান দিয়েই আছি। পৃথিবীতে, প্রাণিকূলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের প্রয়োজন নেই যে। কিন্তু একটি পর্ব- আথ্রোপোডা বা সন্ধিপদী প্রাণী কীটপতঙ্গ দলের বিস্তৃতির সম্প্রসার এবং পৃথিবীতে এদের অপরাজেয় দৌরাত্বের দিকে চোখ ফেরালে নিজেদের সময় সময় অসহায় মনে হয়। মনে হয়, এটি মানুষের যুগ নয়। কীটপতঙ্গের যুগ। সত্যিকার অর্থে হয়ত তাই। কেননা, পৃথিবীতে আমাদের মাথাপিছু কীটপতঙ্গ রয়েছে ৩০ কোটি। এগুলো আমাদের সঙ্গে সব সময় প্রতিযোগিতায় রয়েছে। কৃষি উৎপন্ন থেকে নিয়ে আমাদের জীবিকার সকল রসদ— সহায়-সম্পদ, ঘরবাড়ি, আসবাব, বইপত্র— এমনকি দেহরস, রক্ত সবকিছুতে কীটপতঙ্গ ভাগ বসিয়ে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে তা করেও থাকে। প্রায় সব সময় এই ভাগ বসানো এমন বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায় যে, মানুষ তৎপর হয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে। কিন্তু আমরা সঠিক অর্থে সফল হতে পারি না। কীটপতঙ্গের অভিযোজন ক্ষমতা এত বেশি যে, এগুলোকে নিধন করার ব্যবস্থা করতে চাইলেও পারা যায় না। যে কোন নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এগুলো শারীরবৃত্তীয় কলাকৌশলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর কারণ, এগুলো পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল ৩৫ কোটি বছর আগে— ডেভোনিয়ন যুগে। মুরুব্বিয়ানার মাপকাঠিতে এদের তুলনায় আমরা-তো শিশুরও শিশু। আধুনিক মানুষের বয়স যে বেশি করে হলে মাত্র ৩০ হাজার বছর।

সন্ধিপদী প্রাণীগুলো এদের সাংগঠনিক বিবেচনায় যথেষ্ট উন্নতমানের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের নিকটতম আত্মীয়-প্রাণী হলো — ওয়ার্ম বা অ্যানেলিডা দল। অ্যানেলিডার অতি পরিচিত সদস্য হলঃ কেঁচো ও জোঁক। সন্ধিপদী প্রাণীগুলোর দেহ দ্বিপার্শ্ব প্রতিসম, দেহ খন্ডাংশে বিভক্ত ও কাইটিনযুক্ত বহিঃকাঠামো দিয়ে ঢাকা। এদের উপাঙ্গ সন্ধিযুক্ত। এগুলোর হৃদযন্ত্র পৃষ্ঠদেশীয় এবং স্নায়ু-রজ্জু অঙ্কীয়।

BanglaInternet.com

শ্বাসকার্য সাধারণ নিয়মে শ্বাসরন্ধ্র ও নালীর সহায়তায় সম্পন্ন করে। সন্ধিপদী প্রাণীগুলো দেহের পুরানো চামড়া ছেড়ে ছেড়ে আকারে বড় হয়।

এই পর্বে ১০টির বেশি শ্রেণী থাকলেও পরজীবিতা ও রোগ সংক্রমণের সূত্রে ৩টি মাত্র শ্রেণী-দল উল্লেখযোগ্য। এগুলোকে বলা হচ্ছে ঃ ইনসেক্টা, অ্যারাকনিডা, ও ক্রাসটাসিয়া।

শ্রেণী ইনসেক্টা

এই শ্রেণী-দলের প্রাণীগুলো কীটপতঙ্গ নামে পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এদের অধিকাংশই ডাঙ্গায় বাস করে। প্রাণীগুলোর দেহ মাথা, বুক ও পেট— এই তিন ভাগে বিভক্ত। মাথায় একজোড়া শুঙ্গ ও বুকের খন্ডাংশে ৩ জোড়া পা রয়েছে। পাখা থাকলে তা দুই বা এক জোড়া।

শ্রেণী ইনসেক্টাতে ২৯টি বর্গ রয়েছে। তবে মানুষ ও জীবজন্তুর পরজীবিতা এবং রোগ সংবহনকারী সদস্যদল হিসেবে হেমিপটেরা ও ডিপটেরার নাম সবার আগে আসে। এছাড়া শ্রেণী সাইফোনাপেটেরা, অ্যানাপ্লুরা ও ম্যালোফেগাও উল্লেখের দাবী রাখে।

বর্গ—হেমিপটেরা

এ বর্গের পরজীবী সদস্যগুলো সাধারণত এর উপবর্গ হেটারপটেরার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো সত্যিকার অর্থে 'বাগ'। এখানে অসংখ্য প্রজাতি রয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগ পরজীবী কিংবা উদ্ভিদ-রস খেয়ে বাঁচে। তবে এই দলের কিছু কিছু প্রাণী স্বভাবত রক্তচোষক পরজীবী। এর মধ্যে ছারপোকা আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। সম্ভবত শৈত্য যুগে (আইস এইজ) গুহাতে বাদুর ও চড়ুই জাতীয় পাখির সঙ্গে বসবাসের সময় মানুষ এই পরজীবী পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেই থেকে এগুলো মানুষের স্থায়ী সহচর হয়ে উঠেছে। মানুষ এবং বিভিন্ন বন্য ও গৃহপালিত জীবজন্তুর নানা ধরনের রক্তবাহিত রোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছারপোকা ঃ ছারপোকাগুলো সাইমিসিডি পরিবারের সদস্য। এগুলোর দেহ প্রশস্ত, চ্যাপ্টা এবং লালচে খয়েরী রঙয়ের। এদের পাখা নাই তবে প্রথম পাখা জোড়া প্যাডের মত হয়ে আছে। এগুলোর চোখ মাথার দু'পাশে স্পষ্টতর। শুঙ্গ আছে। পা সাধারণ খন্ডাংশ সম্বলিত (চিত্র-১)। এদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুর্গন্ধ রয়েছে যা অনেক সময় মানুষকে এদের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়।

চিত্র-১ সাধারণ ছারপোকা।

BanglaInternet.com

সত্যিকারের ছারপোকাগুলো 'সাইমেক্স' গণের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার সবগুলো প্রজাতি মানুষে পরজীবী নয়। এগুলোর কোন কোন প্রজাতি পাখি বাদুর ইত্যাদিতে দেখা যায়। মানুষের উল্লেখযোগ্য পরজীবীগুলো হলো, 'সাইমেক্স লেকটুলারিস', 'সাইমেক্স হেমিপটেরাস'। দ্বিতীয় প্রজাতিটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় বা ভারতীয় ছারপোকা নামে পরিচিতি। পশ্চিম আফ্রিকার মানুষদের আক্রমণকারী প্রজাতিটির নাম 'লেপ্‌টোসাইমেক্স বাউয়েটি'।

ছারপোকা সাধারণত রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় এবং দিনের বেলায় দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। পুরানো কাঠের আসবাবপত্রের ফাঁক-ফোকড় এদের প্রিয় আশ্রয়-স্থান। প্রয়োজনে দিনের বেলায়ও কিভাবে পোষকের অজান্তে নিজের ভরপেট রক্ত-আহার সংগ্রহ করতে হয় সেই কৌশল এদের বেশ ভাল জানা। বিশেষ করে যেখানে জনসমাগম হয়, জনসাধারণকে কাঠ বা অন্যান্য জিনিষের তৈরি আসবাবপত্রে হাত রেখে দাঁড়াতে বা বসতে হয়, সেসব জায়গায় এগুলো যুৎসই অবস্থান নেয় এবং আমাদের দেহ থেকে রক্ত চুরি করে পালায়। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকের আছে।

ছারপোকা পোষক দেহ থেকে রক্ত টেনে নেয়ার সময় এদের ঠোঁটটি মাংশের ভেতর ঢুকে যায়। দশ-পনের মিনিটের মধ্যে একটি ছারপোকা ভরপেট খেয়ে নেয়। শুষ নেয়া পুরো রক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছারপোকা দ্বিতীয় বারের মতো খায় না। এগুলো দীর্ঘ অনাহারে অভ্যস্ত। এমন কি বিপাকে পড়ে গেলে বছর খানেকও এগুলো না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ঠান্ডা আবহাওয়া এদের পছন্দ নয় এবং তখন শীতশয়নে যায়।

'সাইমেক্স' গণের প্রজাতিগুলো যদিও মানুষের রক্তই বেশি পছন্দ করে, তথাপি এগুলো সহজে অন্যান্য প্রাণীর রক্ত আহারে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। যেমন, ইঁদুর ও মুরগি। কুকুর, বিড়ালও এগুলো দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এদের ডিম সাদা ও তুলনামূলকভাবে বড়। এগুলোর এক একটি গড়ে ১০০ থেকে ২৫০ টির মতো ডিম দেয়। সাধারণত ৬ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়। পাঁচবার খোলস/চামড়া পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ৭ থেকে ১৩ সপ্তাহের মধ্যে শিশু ছারপোকা পরিণত অবস্থায় যায়। এদের বছর প্রতি প্রজন্মের সংখ্যা ৩ থেকে ৪ টির মতো। পরিণত ছারপোকা প্রায় বছরখানেক বাঁচে।

এদের কামড়ে যে যন্ত্রণা হয়— তা লালাগ্রন্থীয় নিঃসরণে হয়ে থাকে। এদের ঘনঘন কামড়ের ফলে রক্তশূন্যতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, ইন্‌সমনিয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এছাড়া কামড়ের মাত্রা খুব বেশি হলে মাথা ব্যথা থেকে নিয়ে জ্বর, চোখের অসুবিধা— এমনকি হৃৎপিন্ডের ধড়ফড়ানি ইত্যাদি শুরু হতে পারে।

Banglainternet.com

ছারপোকা মানুষের সংক্রামক রোগের বাহক হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। এইসব রোগের মধ্যে কালাজ্বর, মেয়াদী জ্বর, টাইফয়েড, পীতজ্বর, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, বেরিবেরি, ল্যাসমেনিয়াসিস, ফিলারীয়, সংক্রমণ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এদের এইসব রোগ বাহকের নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। তবে এদের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীব লালিত-পালিত হতে দেখা গেছে। সেই সূত্রে সস্তা হোটেল-রেস্তোরা, রাত-কাবারে গাড়ি-ঘোড়া থেকে কিছু কিছু রোগ যে, একজনের দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়াতে পারে— এমনটা ভাবা খুব একটা অযৌক্তিক নয়। কাপড় চোপড়, বিছানাপত্র, বাড়িঘরের সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বারা এর প্রকোপ মোটামুটি কমিয়ে ফেলা সম্ভব।

রেডুভিয়াইডীয় পরিবারের ট্রায়াটোমিনি-এর বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য কীটপতঙ্গ পরভোজী হয়েও মেরুদন্ডী প্রাণীর রক্ত খেতে অভ্যস্ত। এখানকার প্রায় এক শতটির মতো প্রজাতি রয়েছে। এগুলো আকারে বড় এবং দ্রুত চলাচল করতে ও উড়তে পারে। প্রধানত এগুলো ছারপোকাজাতীয় সহোদরে পরজীবী। এছাড়া এগুলো একে অপরকে ধরে চুষেও খেয়ে থাকে। সুযোগ পেলে গৃহপালিত ছোট-বড় জীবজন্তু থেকে নিয়ে অনেক প্রাণীর রক্ত খেতে এগুলো পছন্দ করে। মানুষের নাগালের মধ্যে সবসময় না পড়লেও এগুলো কিছু মারাত্মক সংক্রামক প্রোটোজোয়া বহন করে। এরমধ্যে 'ট্রাইপ্যানোসোমা' গণের প্রজাতিগুলোর নাম করা যেতে পারে।

উকুন বর্গ ঃ (সাইফানকুলাটা ও ম্যালোফেগা)

সম্ভবত আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গ প্রজাতির মধ্যে উকুন বা 'লাইস' আমাদের সবচেয়ে কাছের এবং সর্বাধিক পরিচিত। জনস্বাস্থ্যের বিধি-ব্যবস্থার দুর্বলতা, দারিদ্র্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণে গ্রামেই নয় বরং শহরেও আমাদের দেহে, মাথায় এই পরজীবী প্রাণীগুলোর যথেষ্ট দৌরাত্ম্য রয়েছে।

এরমধ্যে মানুষের পরজীবী উকুন বর্গ— সাইফানকুলাটা-তে (বা অ্যানোপুরা) অবস্থিত। অন্যদিকে পাখি ও পাখিজাতীয় প্রাণীতে পরজীবী উকুন ম্যালোফেগা বর্গের সদস্য। ম্যালোফেগার পরজীবী সদস্যগুলো মানুষ-পোষকে দেখা যায় না।

মানুষের উকুন ঃ প্রধানত ২টি 'গণের' উকুন মানুষকে আক্রমণ করে থাকে। এ দু'টি হলঃ 'পেডিকুলাস' এবং 'পিথিরাস'।

এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, এই ২টি 'গণের' পরজীবী সদস্যগুলো আমাদের গুহাবাসী প্রপিতামহের সময়কালে তাদের দেহে অবস্থান নিয়েছিল। সেই গুহাবাসী মানুষ বিশাল লোমশ হাতি ও ভল্লুকের পরিত্যক্ত গুহায় আশ্রয় নেয়ার সময় এগুলো মানুষের সংস্পর্শে এসেছিল। এগুলো প্রধানত লোমশ দেহের পরজীবী। আদি মানুষও উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে আজকের তুলনায় বেশি লোমশ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা যায়, তখনকার যুগের মানুষ যথেষ্ট অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বসবাস করত।

BanglaInternet.com

মানুষ যেমন বিবর্তন, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ধারার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আজকের এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তেমনি পরজীবী 'উকুনগুলোরও অভিযোজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে খুব অল্প সংখ্যক প্রজাতিই মানুষের দেহে টিকে গেছে। এর মধ্যে 'পেডিকুলাস হিউমেনাস' — মাথার সাধারণ উকুন এবং 'পিথিরাস পিউবিস' — দেহের উকুনের মধ্যে বেশ পরিচিত।

মাথার উকুন ঃ মাথার উকুন, 'পেডিকুলাস হিউমেনাস-এর চোখ এবং ৫ খন্ডবিশিষ্ট শুল রয়েছে। এদের উদর শত খন্ডযুক্ত। এই পরজীবীর স্ত্রী আকারে পুরুষের চেয়ে সামান্য বড়। পুরুষ উকুনের পায়ুপথ ও যৌনাঙ্গ পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত (চিত্র-২)

চিত্র-২
মাথার উকুনের ডিম।

এই উকুনগুলো সাধারণত মানুষের চুলে বসবাস করে। এগুলো পৃথিবীর সর্বত্রই বিস্তৃত।

উকুনের ডিম ছোট— সম্পূর্ণ গোলাকার নয় এবং এর মাথায় একটা ঢাক্না রয়েছে, যার সাহায্যে সহজে এগুলো শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। স্ত্রী উকুন ডিমগুলো চুলের গোড়ায় আঠা দিয়ে এঁটে দেয় (চিত্র-২ খ)। ফলে এগুলো সাধারণ চিরুনীতে ধরা পড়ে না। এদের ডিম দেয়ার প্রিয় জায়গা মানুষের কানের কাছাকাছি। গড়-পড়তায় প্রতিটি উকুন ৮০ থেকে ১০০টির মতো ডিম দেয়। ডিমগুলো ৮-১০ দিনের মধ্যে ফোটে এবং বেশি তাপমাত্রায় এগুলো বাঁচে না। আবার বেশি শীত এদের ডিম দেয়ার ও ফুটার হার কমিয়ে দেয়। ডিম থেকে ফুটেই এগুলো খেতে শুরু করে। পরিণত অবস্থায় যেতে এদের ১৬—১৭ দিন সময় লাগে। পরিণত উকুন ৩৫ থেকে ৪০ দিনের মতো বাঁচে।

উকুন সাধারণত মাথার চামড়ায় একটি ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং সেখানটায় এদের লালাগ্রন্থির রস মিশিয়ে তা পাম্প-কৌশলে পাকস্থলীতে টেনে নেয়। একবারে তা না টেনে এগুলো রয়ে রয়ে রক্ত খেয়ে থাকে। উকুনের কামড়ে পোষক-মানুষের দেহে অ্যালর্জিয় ক্ষত, হাল্কা জ্বর এবং এর সঙ্গে শারীরিক ক্লান্তিও দেখা দেয়।

এছাড়া উকুন এক পোষক দেহ থেকে অন্য মানুষের দেহে মূলত ৩টি রোগের জীবাণু ছড়িয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে ঃ টাইফাস, খন্দক-জ্বর (ট্রেঞ্চ ফিভার) ও মেয়াদী জ্বর। টাইফাস-জীবাণু বাহক উকুনের জন্যও মারাত্মক, তবে তা ধীরেসুস্থে হয় বলে সেই সময়ের মধ্যেই রোগজীবাণু অন্য দেহে সংক্রমিত হয়ে যায়। এই টাইফাস রোগ ঐতিহাসিক আমলে সময় সময় যথেষ্ট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। এই রোগ বিস্তারের কারণে নেপোলিয়ন রাশিয়া থেকে তাঁর সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছিলেন। এই মহামারীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় ৩০

BanglaBook.org

লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। তবে এই উপমহাদেশে এ ধরনের কোন ব্যাপক সংক্রমণের খবর শোনা যায় না। গন্ধক-জ্বর তেমন মারাত্মক না-হলেও নানা ধরনের শারীরবৃত্তীয় অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মেয়াদী-জ্বর এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে এবং সেখানকার প্রায় অনেক জায়গায় এর প্রকোপ লক্ষ্য করা যায়।

ঐতিহাসিক আমলে উকুনের দ্বারা প্লেগ-বেসিলাস ছড়াতো বলে জানা গেছে। এছাড়া উকুন 'টুলেরেমিয়া'-এর রোগ জীবাণু বহন করে থাকে। এইসব কোন সরাসরি উকুনের কামড়ে হয় না বলে ধারণা করা হয়। তবে তা এদের বর্জ্য বস্তু বা মৃতদেহের সংমিশ্রণের দ্বারা হয়— এমন প্রমাণাদি রয়েছে।

দেহের উকুন : সাধারণভাবে এগুলো কাঁকড়া উকুন বা 'পিথাইরাস পিউবিস' নামে পরিচিত এবং আকৃতিগতভাবে এরা মাথার উকুনের চেয়ে ভিন্নতর। এদের দেহ প্রশস্থ , কিন্তু লম্বা নখরবিশিষ্ট পা রয়েছে। বুকে যুক্ত খণ্ড রয়েছে। অন্যদিকে উদর তেমনি সংক্ষিপ্ত (চিত্র-৩)।

এদের স্ত্রী পুরুষের তুলনায় বড়। এদের বসবাসের প্রিয় স্থান দেহের যে অংশে লোম রয়েছে সেসব জায়গা। এমন কি দাড়ি, চোখের পাপড়িতেও এদের চলাচল দেখা যায়। দেহ-উকুনের ডিম দেয়ার সংখ্যা মাথার উকুনের চেয়ে বেশি। তা ২০০-৩০০ পর্যন্ত হয়। ডিম ৭-৮ দিনের মধ্যে ফুটে এবং এগুলো ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রজননক্ষম অবস্থায় চলে যায়। পরিণত উকুন কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাঁচে।

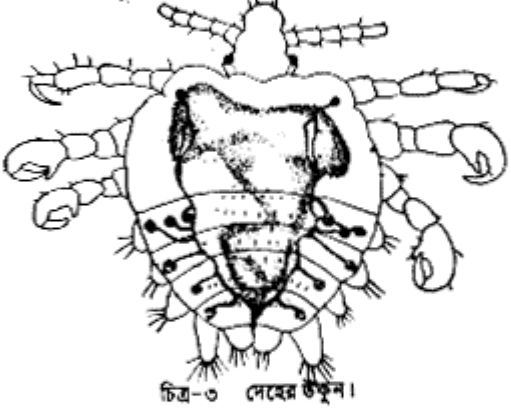

চিত্র-৩ দেহের উকুন।

এগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পোষক দেহ থেকে রক্ত চুষে নেয়, যার ফলে ক্ষতস্থানে চুলকানি অনুভূত হয়। কাঁকড়া উকুন মাথার উকুনের মতো এত সচল নয়। তবে এগুলো সময় সময় এদের অবস্থান পরিবর্তন করে। এগুলোর রোগ সংক্রমণের ধারা মানুষের জন্য খুব ক্ষতিকর নয়।

বর্গ সাইফাসকুলাটার দু'টি পরিবার মাত্র গৃহপালিত জীবজন্তুতে পরজীবী। এরমধ্যে 'হিমাটোপিনাস' গণের প্রজাতিগুলো শূকর, ঘোড়া ও গবাদিপশুকে আক্রমণ করে থাকে। গবাদি-পশুর পরজীবী প্রাণীগুলোর মধ্যে গরুর 'ছোট নাক উকুন' ও গরুর 'লেজওয়ালা উকুন' উল্লেখযোগ্য। এগুলো সময় সময় তুলনামূলকভাবে ছোট পোষক যেমন, ইঁদুর ও ইঁদুরজাতীয় প্রাণীতে বিস্তারলাভ করতে দেখা যায়। এসবের

BanglaBook.org

আক্রমণে পোষক দেহের লোম ও চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের যত্রতত্র বিচরণের ফলে পোষক স্বভাবতই অস্থিরতায় ভোগে এবং এগুলোকে সর্বক্ষণ জিহ্বার সাহয্যে দেহ চাটতে দেখা যায়।। এছাড়া কখনো কখনো পোষক প্রাণী ক্ষুধামন্দায় ভোগে। এই পোষক প্রাণীগুলো স্বাভাবিকভাবে তখন সহজে অন্য রোগ সংক্রমণে স্পর্শকাতর হয়।

বর্গ ম্যালোফেগার সদস্যগুলোকে প্রশস্থ মাথা (বক্ষাংশের চেয়ে প্রশস্থ) এবং মাথার অঙ্কীয় দিকে শক্ত চিমটার মতো ম্যানডিবল দিয়ে সহজে সনাক্ত করা যায়। এদের পা ছোট এবং তা সাইফানকুলাটার মতো আঁকড়ে ধরার উপযোগী।

এই বর্গে ২ টি উপবর্গ রয়েছে ঃ ক) অ্যামব্লিসেরা খ) ইসচোনোসেরা। এ দু'টি উপবর্গকে প্রধানত এদের শুঙ্গের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক করা যায়। প্রথম উপবর্গটি হাঁস-মুরগিতে এবং দ্বিতীয়টি স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরজীবী।

এই পর্বের পরজীবী প্রাণীগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পোষক দেহে বসবাস করে। তবে স্তন্যপায়ীর দেহের পরজীবীগুলো তুলনামূলকভাবে স্থায়ী এবং পুরোপুরিভাবে পোষকের লোম ও ত্বকীয় আঁইশ খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। পাখির পরজীবীগুলো সাধারণত দ্রুত চলাচলে অভ্যস্ত। এদের খাদ্য স্বভাব ভিন্নধর্মী। এগুলো পাখির পালকের গোড়া বা চামড়া খুচিয়ে রক্ত খায়। পাখিগুলোও এদেরকে ঠোঁট দিয়ে খুঁজে ধরে খায়। পোষক পাখি যদি এতে খুব সমর্থ না হয় তখন পরজীবী সংখ্যায় খুব বেড়ে যায়। রুগ্ন একটি মুরগির দেহে ৮ হাজারের ওপর ম্যালোফেগীয় উকুন পাওয়া গেছে।

এই প্রাণীগুলোর ডিম স্ত্রী পরজীবী পোষক পালকের নিরাপদ স্থানে আঠা দিয়ে এঁটে দেয়। 'কবুতর উকুনের ডিম' ৪ দিনে ফুটে নিম্ফ পর্যায়ে এবং ৩ সপ্তাহের মধ্যে পরিণত অবস্থায় যায়। এই পরজীবীগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক সীমারেখায় সীমিত এবং এগুলো সাধারণভাবে নির্দিষ্ট প্রজাতি-নির্ভর। এই প্রজাতিগুলো পোষক দেহের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে ছড়ায়।

বর্গ— সাইফোনাপটেরা

এই বর্গের পোকাগুলো সাধারণভাবে ফ্লি বা ফ্লি-পোকা নামে পরিচিত। এগুলো আকারে বেশ ছোট এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্ত খেয়ে জীবন ধারণ করে। এদের কামড় বিরক্তিকর ও যন্ত্রনাদায়ক। এগুলো কিছু কিছু মারাত্মক রোগ জীবাণুর বাহক। এর মধ্যে ঐতিহাসিক আমল থেকে প্লেগ ও সান্নিপাতিক টাইফয়েড বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কলেরা-বসন্তের মতোই প্লেগ সময় সময় মহামারীর রূপ নিয়েছে। এই রোগ তিন ধরনের। যথাঃ গ্রন্থিসফীতি প্লেগ, ফুসফুসীয় প্লেগ ও রক্ত প্লেগ। এই রোগ চৌদ্দ শতকে ইউরোপের এক চতুর্থাংশ মানুষের প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়ে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ এই

BanglainternetCom

রোগে প্রাণ হারিয়েছিল। ভারতীয় প্লেগ কমিশন ১৯১৪ সনে এই রোগ সংক্রমণের ধারা আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। তখনকার এই রোগ বিশেষজ্ঞরা পর্যবেক্ষণ করলেন, এই রোগ সংক্রমিত পোষক প্রাণীদেহের রক্ত থেকে ফ্লি দ্বারা অন্য দেহে ছড়ায়। সময় ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতির সাথে সাথে এই সংক্রমণের প্রকোপ কমে এসেছে। সারা পৃথিবীতে ১৯৫৬ সালে ৭ শতের কম প্লেগ-রোগীর খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে এক সময় কেবল ভারতে ৫ লক্ষ লোক প্লেগে আক্রান্ত হত। এই রোগের পোষক প্রাণী সাধারণত কয়েক ধরনের ইঁদুর। সুতরাং 'ইঁদুরকে' এই রোগের আধার বলা যেতে পারে। এই আধার দেহ থেকে ফ্লি এই রোগ 'বেসেলি' তিনভাবে ছড়ায় বলে ধরে নেয়া হয়। প্রধানত ফ্লি-এর পৌষ্টিক নালী এই জীবাণু দ্বারা অবরুদ্ধ থাকার কারণে মুখ দিয়ে ফিরে আসা রক্তের সঙ্গে, দ্বিতীয়ত প্লেগ-জীবাণু যুক্ত মল পোষক ক্ষতে পৌঁছে গেলে এবং তৃতীয়ত কোনভাবে আক্রান্ত ফ্লি পোষকের পেটে চলে গেলে পোষক দেহে এই সংক্রমণ হয়।

স্থানীয় বা সান্নিপাতিক টাইফয়েড ফ্লি-পোকা ও দেহ-উকুন দ্বারা ছড়ায়। এটি প্রাথমিকভাবে ইঁদুরের রোগ। ফ্লি-পোকা কমপক্ষে ২টি ফিতা কৃমি প্রজাতির মধ্য-পোষকও।

পূর্ণাঙ্গ ফ্লি-পোকার দেহ স্পষ্টভাবে দু'পাশ থেকে চ্যাপ্টা। এদের দেহে অসংখ্য পেছনমুখী কাঁটা ও লোম রয়েছে। ফলে এরা খুব সহজে পোষক দেহের লোমের ভেতর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে। এদের পা লম্বা ও বেশ বলিষ্ঠ যার জন্য এগুলো বেশ লাফাতে পারে। এগুলোর মুখাংশ প্রোবোসিস সদৃশ যা পোষক দেহের চামড়া ছিদ্র করে সহজে রক্ত চুষে নিতে পারে। এদের ছোট মাথা প্রশস্থ হয়ে বক্ষের সঙ্গে জুড়ে থাকে। উদরের ১০টি খন্ডাংশের শেষের ৩টি জনন-উপাঙ্গরূপে পরিবর্তিত হয় (চিত্র-৪)। এদের অন্ননালী সফীতকায় প্রোভেন্ট্রিকুলাসের মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছায়। দৈর্ঘ্যে পাকস্থলী পেটের প্রায় সমান হতে পারে। এখানে রেচন কার্যের জন্য ম্যালপিজি নালিকা রয়েছে।

চিত্র-৪ পরিণত ফ্লি-পোকা।

ফ্লি-পোকার জীবন-চক্রে পরজীবী ও মুক্ত - উভয় পর্যায়ই রয়েছে। এগুলোর ডিম আকারে বেশ বড়। অনেক সময় তা এদের দেহের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। একবারে এগুলো বেশ কিছু ডিম দিয়ে থাকে। একটি স্ত্রী ফ্লি গড়পড়তায় ৩০০-৫০০ ডিম

BanglaInternet.com

দিয়ে থাকে। এরা সাধারণত ডিম দেয়ার সময় পোষক দেহ ত্যাগ করে এবং ময়লা-আবর্জনা, ধুলো দিয়ে তৈরি বাসায় ডিম দেয়। আনুমানিক ২/৩ দিন থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে ডিম থেকে পা-বিহীন শূককীট বের হয়। শূককীটের দেহে পাতলা-পাতলা লোম থাকে। এই শিশু ফ্লিগুলো জৈব আবর্জনা, নিজেদের পরিত্যক্ত খোলস ও পূর্ণাঙ্গ ফ্লি-পোকার মল খেয়ে জীবনধারণ করে। এই শূককীটগুলো দেখতে ছোট্ট শুঁয়া পোকার মতো। খড়কুটা, বালি-ময়লা ইত্যাদি দিয়ে গুটি তৈরি করে সেখানে এরা মূককীট পর্যায়ে যায়। সেই অবস্থা থেকে ১-৪ সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ফ্লি-তে পরিণত হয়। এই পরিণত ফ্লি সহজে পোষক প্রাণী খুঁজে নেয় এবং এরা প্রতিদিন একবার অন্তত রক্ত খায়।

মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণীদলের সঙ্গে সম্পর্কিত পরজীবী ফ্লি-গণগুলো হচ্ছেঃ 'পিউলেক্স','টিনোসেফালিডেস', 'জ্যানোপসাইলা', 'টুঙ্গা' ইত্যাদি।

'পিউলেক্স ইরিটেন্স' প্রজাতিটি মানুষের ফ্লি-পোকা নামে পরিচিত হলেও এটি প্রায়শ গৃহপালিত জীবজন্তুকেও আক্রমণ করে থাকে। সম্ভবত এই পরজীবী পোকাটি ইউরোপে উদ্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

'টিনোসেফালিডেস কেনিস' ও 'টিনোসেফালিডেস ফেলিস' প্রধানত কুকুর ও বিড়ালে পরজীবী হলেও তা মানুষে ভর করতে দেখা যায়। এগুলো যখন-তখন পোষক-দেহ পরিবর্তন করতে পছন্দ করে। এগুলোকে এদের অসংখ্য দাঁতের বৈশিষ্ট্যের জন্য সহজে অন্যান্য ফ্লি থেকে আলাদা করা যায়। এগুলো কুকুর-বিড়ালে বসবাস করে বলে মানব শিশুতে এগুলো কুকুর-ফিতা কৃমি ('ডিপাইলিডিয়াম') ছড়াতে সক্ষম হয়।

'জ্যানোপসাইলা চিয়োপিস'- 'প্রাচ্যের ইঁদুর-ফ্লি' নামে পরিচিত। এটি মানুষের আবাসস্থলে বাস করে বলে মানুষ সহজে এদের শিকারে পরিণত হতে দেখা যায়। এই প্রজাতিটির সাথে 'পিউলেক্স ইরিট্যান্স' এর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। এই পরজীবীগুলো প্লেস জীবাণুর বাহক। এছাড়া এটি 'হাইম্যানোলোপিস' জাতীয় ফিতাকৃমিও ছড়ায়।

'টুঙ্গা পেনিট্রান্স' প্রজাতি 'জিগার' 'চিগোস' বা বেলে ফ্লি নামে পরিচিত। এটি আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে উদ্ভব হয়েছিল এবং ১৮৭২ সালে তা পশ্চিম আফ্রিকা ও পরবর্তীকালে সমগ্র আফ্রিকাতে ছড়িয়ে গেলেও এগুলো ইউরোপ বা ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। এই পরজীবীগুলো প্রথমত পোষক দেহের চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করে সেখানে ডিম দেয়। এর ফলে রোগী-দেহে ব্যথা ও দ্বিতীয় পর্যায়িক সংক্রমণ থেকে হাত-পায়ের আঙ্গুলে নীলা-ফুলা-পঁচন ইত্যাদি দেখা দেয়। ফলে অঙ্গহানিও ঘটে থাকে। এমন কি গ্যাংগ্রিন ও টিটেনাসের প্রকোপে রোগীর মৃত্যুও হয় সময় সময়।

BanglaInternet.com

এছাড়া 'ইকিডনোফ্যাগা' গণের ফ্লি-গুলো হাঁস-মুরগিতে পরজীবী। সাধারণত এদের স্ত্রীগুলো পোষক দেহের, বিশেষ করে হাঁস-মুরগির মাথায় ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানে ঘনিষ্ঠভাবে এঁটে থাকে। এগুলো সময় সময় কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী- এমনকি শিশুতেও ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়।

এই প্রাণিদলের কামড় বিরক্তিকর ও যন্ত্রনাদায়ক। এছাড়া এগুলোর পরজীবিতার কারণে যে সকল সংক্রামক রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়- তা নিয়ন্ত্রণ করা খুব একটা কঠিন নয়। আমাদের বাসস্থানের আশেপাশের পরিচ্ছন্নতা থেকে নিয়ে গৃহপালিত জীবজন্তুর সুস্থ ও বিজ্ঞানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণ এগুলোর নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে তবে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সচেতন থাকা দরকার। কেননা, এটাই প্রধান মাধ্যম যার সাহায্যে মানব-সভ্যতার অন্যতম মহামারী সারা বিশ্বকে একসময় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সজাগ না থাকলে পুনরায় সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে আমাদের মতো অনুন্নত অঞ্চলে।

বর্গ -ডিপ্টেরা

ডিপ্টেরা বর্গের পরজীবী প্রাণীদল রোগ সংক্রমণের দিক থেকে এককভাবে সমগ্র সন্ধিপদী প্রাণিগোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে যায়। এই দলের পরজীবী সদস্যগুলো মানুষের মারাত্মক ও জীবন-হরণকারী রোগ-বালাই - ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ট্রাইপেনোসোমাইয়াসিস, ল্যাসমেনিয়াসিস, ওরাইয়া জ্বর, ফিলারিয়াসিস, পীতজ্বর, ডেঙ্গু, বেলেমাছি জ্বর, অ্যানসেফালাইটিস ও অন্যান্য ভাইরাসীয় সংক্রমণ ইত্যাদির জন্য দায়ী। এছাড়াও আমাদের চতুষ্পার্শ্বের অস্বাস্থ্যকর ময়লা পরিবেশ থেকে মাছির উৎস নানাবিধ রোগ-সংক্রমণ করে থাকে। আমাদের সাধারণ ঘরের মাছিও এই উৎপাতে যথেষ্ট ইন্ধন জোগায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত : ডিপ্টেরা বর্গের এই সকল রোগ সংক্রমণ/বাহক মাছিগুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণে এলে উপরোক্ত সংক্রামক ব্যাধিগুলো পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যেত।

এই বিরাট বর্গের সকল সদস্যকে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আওতায় ফেলা যায়। যেমন, এগুলোর কেবল এক জোড়া ঝৈল্লিক পাখা থাকে। দ্বিতীয় পাখাটি ছোট গোলাকার 'নবের' মতো হয়ে 'হল্টেয়ার' নামে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলো খুব দ্রুতগতিতে (সেকেন্ড প্রতি ৩০০ বার) ঘুরে এবং তা দেহের সুষমতা বা 'ব্যালেন্স' করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের পা কীটপতঙ্গের মতো হলেও কক্সা সাধারণত লম্বাটে ধরনের। এদের মাথা খুব সরু সংযোগের দ্বারা বুকের সঙ্গে লেগে থাকে। বুকের খন্ড তিনটি। উদরে দৃশ্যত ৪ থেকে ৯টি খন্ড রয়েছে এবং এই অংশের শেষাশেষি স্ত্রী মাছির ডিম দেয়ার জন্য একটি এবং পুরুষ মাছির মিলন-অঙ্গ থাকে। এদের রূপান্তর পূর্ণ ও শূককীট সাধারণত 'ম্যাগট' নামে পরিচিত। এই ম্যাগটগুলোর

Banglainternet.com

মাথা ও দেহাঙ্গ খুব স্পষ্ট না হলেও এগুলো দ্রুত চলাচলে সক্ষম। এদের শূককীট নানা ধরনের হয়ে থাকে।

সার্বিক বিবেচনায় ডিপ্টেরীয় বর্গের পরজীবী সদস্যগুলোর মধ্যে জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যে রক্তচোষক পতঙ্গটির নাম সবার আগে আসে তা হল- মশা। এরপর ক্রমান্বয়ে বেলেমাছি, কালোমাছি, ঘোড়ামাছি, হর্ন ও আস্তাবল মাছি, ঘরের মাছি, ভোঁ ভোঁ মাছি, সেট্‌সি মাছি, উঁকুন মাছি ইত্যাদি রয়েছে। আমাদের জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মশা ঃ আমাদের জনজীবনে 'মশা'র বোধ করি আর কোন পরিচয় দেয়ার দরকার হয় না। এগুলোর বিরক্তিকর যন্ত্রনাদায়ক কামড়, এর নানাবিধ রোগ-সংক্রমণ নিয়েই এদের সঙ্গে আমরা সহাবস্থান করি। কোন কোন সময় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাদের ঘরবাড়ি, আস্তানা বেশিরভাগ সময় থাকে এদের দখলে। সন্ধ্যা থেকে আমাদের ঘরবাড়িতে তাই-তো হয়। এদের কামড়, অত্যাচার, রোগ-সংক্রমণ মেনে নিয়েই আমরা যার যার বাসস্থানে অবস্থান করি। টিকে থাকি।

মশা উপবর্গ নিম্যাটোসেরার কিউলিসিডি পরিবারের সদস্য। কিউসিলিডি পরিবার ৩টি উপপরিবারে বিভক্ত। এর মধ্যে কেবল কিউলিসিনি উপ-পরিবারটির পরজীবিতা ও চিকিৎসা সম্পর্কীয় গুরুত্ব রয়েছে। কিউলিসিনি উপ-পরিবারের গোত্র তিনটির মধ্যে অ্যানোফিলিনি ও কিউলিসিনি গোত্রের সদস্যগুলো রোগবাহক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কিউলিসিডি পরিবারে ২০০০-এর মতো প্রজাতি বর্ণিত হয়েছে। এর বেশির ভাগ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সদস্য। আমেরিকা ও কানাডায় ১২০টির মতো প্রজাতি রয়েছে।

ডিপ্টেরা বর্গের পরিবার কিউলিসিডি-এর বহিরাঙ্গ, পাখার আঁইশের বৈশিষ্ট্য-বিবেচনায় সহজে আলাদা করা যায়। এদের লম্বা সুস্পষ্ট প্রোবোসিস রয়েছে- যার সুঁইয়ের মতো ছিদ্রণ ও চোষক অঙ্গ আছে। এটি দিয়ে মশা পোষকের দেহ থেকে রক্ত টেনে নেয় (চিত্র-১)।

মশার জীবন-চক্রে যে কয়টি পর্যায় রয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ ডিম, শূককীট, মূককীট ও পরিণত অবস্থা। শূককীট ও মূককীট পর্যায়ে এগুলো জলজ মাধ্যমে কাটায়। অবশ্য কোন কোন প্রজাতির মশার ডিম মাসের পর মাস, এমনকি বছরেরও বেশি সময় শুক্‌নো জায়গায় ভাল অবস্থায় থাকতে দেখা গেছে। আবার শীতের দেশে মশা গ্রীষ্ম-শরতে যে ডিম দেয় তা বরফ ঢাকা অবস্থায় অনেকদিন থাকে। এবং বরফ গলতে থাকলে তা শূককীট হয়ে বেরিয়ে আসে।

Banglainternet.com

জলে পাড়া ডিমগুলো ভেলার মতো হয়ে শান্ত জলাশয়ের কিনারায় ভাসতে থাকে। ডিমগুলোর উদ্ভিকাল কয়েকদিন মাত্র। এরপর এগুলো শুককীট পর্যায়ে যায়।

কিউলিসিনি গোত্রের শূককীট পানির উপরিভাগে কিছুটা কোণ করে, মাথা নিচের দিকে রেখে শ্বসন নলের সাহায্যে ঝুলে থাকে। অন্যদিকে অ্যানোফিলিনির সদস্যগুলো পানির সমান্তরালে অবস্থান নেয়। অধিকাংশ প্রজাতির শূককীট ছোট ছোট উদ্ভিদ, প্রাণি ও অনুজীব খেয়ে থাকে। মূককীট পর্যায়ে এরা আহার করে না।

পূর্ণাঙ্গ পুরুষ মশার মুখাংশ অনুবিদ্বনের অনুপোযোগী– যার ফলে এগুলো রক্ত চুষে খেতে পারে না। এরা ফুলের রস, গাছের তরল পদার্থ ও অন্যান্য নির্যাস গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে বেশিরভাগ প্রজাতির স্ত্রী মশা বিভিন্ন প্রাণিদেহে পরজীবী ও রক্ত চুষে খায়। স্ত্রী মশার ডিম দেয়ার আগে সাধারণত রক্তাহারের প্রয়োজন হয়। তবে রক্ত না খেয়ে ডিম পাড়ে এমনও অনেক মশক প্রজাতি রয়েছে। পুরুষ মশা সপ্তাহখানেক বাঁচে। অন্যদিকে স্ত্রী মশা পর্যাপ্ত খাবার পেলে ৪–৫ মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা যায়।

গণ 'এনোফিলিস'–এর মশাগুলো মূলত মানুষের ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু ('প্লাজমোডিয়াম' প্রজাতি) ছড়ায়– যা পৃথিবীতে আজও মানুষের মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির একটি বলে পরিগণিত। প্রায় ২ শতের মতো 'অ্যানোফিলিস' প্রজাতি বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ডজনখানেক প্রজাতি ম্যালেরিয়া রোগের উল্লেখযোগ্য বাহক হিসাবে চিহ্নিত। 'কিউলেক্স' ও 'এইডিস' গণের প্রজাতিগুলো পাখি ও সরীসৃপে এ রোগ সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। তবে কিউলিসিনের কোন কোন প্রজাতি 'প্লাজমোডিয়াম'–এর বাহক বলেও জানা গেছে।

বেলে মাছি ঃ এই ফ্লেবোটমাছ মাছিগুলো আকারে ছোট, দেহ রোমশ এবং পৃথিবীর সকল চরম ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় ভূখন্ডে এগুলো বিস্তৃত। বেলে মাছি মানুষের কতগুলো মারাত্মক রোগ বিস্তারে সহায়তা করে থাকে। এর মধ্যে ল্যাসমেনিয়াসিস, তিন–দিনের জ্বর (বেলে মাছি জ্বর), ওরাইয়া জ্বর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বেলে মাছির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাখার শিরাবিন্যাস দ্বারা সহজে চেনা যায়। এছাড়া এগুলো বিশ্রামরত অবস্থায় পাখা ওপরের দিকে উঁচিয়ে রাখে। এদের শুঙ্গ দীর্ঘ এবং প্রোবোসিস মাথার দৈর্ঘ্যের চেয়ে লম্বা। প্রোবোসিসে ডেগারের মতো কর্তন–অঙ্গ রয়েছে যা পোষক দেহ ছিদ্র করে রক্ত শুষে নিতে পারে (চিত্র–৫)। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা মশার মতোই।

চিত্র–৫ 'ফ্লেবটমাস' প্রজাতির মাছি।

Banglainternet.com

বেলে মাছি 'সাইকোডিডি' পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর ৪টি উপ-পরিবারের মধ্যে কেবল ফ্লেবটমিনির সদস্যগুলোই রক্ত চোষক এবং এগুলোই মূলত রোগ-বালাইয়ের বাহক।

মশার মতো এই বেলে মাছির স্ত্রী-সদস্যগুলোই শুধু মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরজীবী। তবে কিছু কিছু প্রজাতি এককভাবে শুধুমাত্র টিকটিকি ও নির্দিষ্ট ইঁদুরজাতীয় প্রাণীতে পরজীবী। এই মাছির কামড়ের সময় পোষক দেহে শুধু যে চুলকানি অনুভূত হয় তাই নয় বরং স্থানীয় অ্যালার্জীয় বিক্রিয়াও দেখা দেয়। কোন কোন প্রজাতির মাছি কেবল এক গোছা ডিম (৪০-৬০টি) দিয়েই দ্বিতীয়বারের মতো রক্ত খায়। অন্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ডিম দেয়ার সঙ্গে এদের খাদ্যাভ্যাসের খুব একটা সম্পর্ক নাই। ডিমের উন্তিকাল ৪-৯ দিনের মতো। সূর্যতাপে এগুলো সহজে নষ্ট হয়ে যায়। এদের শূককীট দেখতে অনেকটা শূঁয়া পোকার মতো। শূককীটের দেহে অসংখ্য দাঁতাল কাঁটা রয়েছে। এগুলো পঁচা গাছগাছালি, জৈব্য বর্জ্য ইত্যাদি খায়। উচ্চ আর্দ্রতায় এগুলো ভাল বাড়ে। শূককীটের পরিণত রূপান্তর ২ সপ্তাহ থেকে ২ মাসকাল সময়ে সংঘটিত হয়ে থাকে।

কালো মাছি বা মহিষ ন্যাট ঃ এই বিশিষ্ট মাছিগুলো 'সাইমুলিয়াইডি' পরিবারের সদস্য। এগুলো যে মানুষ ও গৃহপালিত জীবজন্তুর সাধারণ বিরক্তির কারণ তাই নয় বরং অসংখ্য গৃহপালিত পশু - এমন কি শিশুর ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ এবং শ্বাসনালীর অবরোধের জন্য মৃত্যুরও কারণ বলে জানা যায়। এই পরজীবী মাছির আক্রমণে ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডায় হাজার হাজার গবাদি-পশুর প্রাণহানি ঘটে। এগুলো সারা বিশ্বে বিস্তৃত। তা উষ্ণমন্ডল থেকে নিয়ে বরফ ঢাকা পর্বতমালা সব জায়গায় এদেরকে পাওয়া যায়। এদের অবস্থানের যে একটি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন তা হল, ধীরে প্রবহমান জলধারা। এ দলের পরজীবী সদস্যগুলো 'সাইমুলিয়াম' গণের অন্তর্ভুক্ত।

কালো মাছি ছোট, বলিষ্ঠ, কুঁজো পিঠের পতঙ্গ। এদের পা ছোট, পাখা প্রশস্থ এবং ১১ খন্ডবিশিষ্ট শুঙ্গ রয়েছে। স্ত্রী মাছির প্রবোসিস খাট, মোটা ও শক্তিশালী (চিত্র-৬)। অন্যদিকে পুরুষ মাছি তেমনটা নয়- কেননা, এগুলো রক্তচোষক নয়। মুখাংশে ফ্লেবোটমাসের মতো ডেগার সদৃশ দাঁত রয়েছে যা পোষকের দেহ-ত্বক কর্তনে সহায়তা করে থাকে।

এই পরজীবী মাছিগুলো প্রবহমান জলে বংশবিস্তার করে। তবে জলস্রোতের গতির নির্বাচন প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে ভিন্নতর হয়ে থাকে। সাধারণত এরা জলজ উদ্ভিদ ও পাথরে ডিম দেয়। কয়েক দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। শূককীটের ক্ষণপদ ও আঁকড়ি রয়েছে। এদের মুখে এক ধরনের ফ্যান রয়েছে যার সাহায্যে এরা নিজেদের মুখ-গহ্বরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ঠেলে দেয়
এগুলো দলবদ্ধভাবে থাকে। মূককীট পর্যায়ে যাওয়ার সময় এগুলো এদের চর্তুদিকে

BanglaInternet.com

আংশিক 'কোকুন' বা গুটি তৈরি করে। মূককীট থেকে পরিণত মাছি হতে ৩ থেকে সপ্তাহ কাল সময় নেয়। এদের পরিণত জীবন স্বল্পকালীন। কালো মছি এককভাবে মানুষের 'অঙ্কোসেরোসিস' ও পাখির 'লিউকোসাইটোজোন' রোগ-জীবাণুর বাহক। এছাড়া ইঁদুরের সংক্রামক রোগ 'মাইয়োক্সমেটসিস বিস্তারেরও সহায়ক বলে জানা গেছে।

ঘোড়ামাছি : এই দিবাচর মাছিগুলো 'টেবানিডি' পরিবারের সদস্য। ঘোড়ামাছি ছাড়াও সময় সময় এগুলোকে গ্যাডমাছি, হরিণমাছি নামে চিহ্নিত করা হয়, কেননা এগুলো মূলত প্রাণীতে পরজীবী। তবে এ দলের অনেক মাছি প্রজাতি মানুষকেও আক্রমণ করে থাকে। এই পরজীবী টেবানিড প্রজাতি দ্বারা যেসব রোগ-সংক্রমণ হয় এর মধ্যে ট্রাইপ্যানোসোমাসিস, টুলারেমিয়া, অ্যানাপ্লাজমোসিস, লোয়া-লোয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলো আকারে বড় ও শক্তিধর। এদের দেহ নানা রঙে বর্নীল। এদের মাথা বড় এবং পুরুষের বেলায় এদের চোখ প্রায় পুরো মাথা জুড়ে আছে। স্ত্রী মাছির ক্ষেত্রে চোখের বিস্তৃতি সামান্য সংক্ষিপ্ত। এদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শুঙ্গ রয়েছে। এদের মুখাংশ মোটামুটি কালো মাছির মতো। এগুলো ভাল উড়তে পারে। এখানকার পরিচিত গণ-'ক্লাইসপ্স'।

এরা একত্রে ভেজা গাছের পাতায় বা জলজ গাছে শত শত ডিম দিয়ে থাকে। ডিমগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঠাল জলনিরোধক পদার্থ দিয়ে একত্রে গ্রথীত থাকে। সাধারণত এগুলো বর্ষা মৌসুমে ডিম দেয় যা ৪-৭ দিনে ফোটে।

চোঙাকৃতির শূককীটের পা থাকে না। এদের খন্ডাংশ সংখ্যা ১১টি এবং তা কাঁটা বা লোমাবৃত। এই পরিবারের অধিকাংশ শূককীট প্রাজাতি নরমদেহী কেঁচোজাতীয় প্রাণীতে পরজীবী। এমনকি খাদ্যাভাব দেখা দিলে নিজের জাতের সহোদরকে ধরে খায়। এছাড়া এগুলো মরা জৈববস্তু খেতে অভ্যস্ত। মূককীটীয় কাল ১-২ সপ্তাহ স্থায়ী হয়। কোন কোন অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে টেবানিডীয় শূককীটের পরিণত অবস্থায় পৌছুতে ৩ বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। বছরে এদের প্রজন্ম মাত্র একটি।

উপবর্গ সাইক্লোর‍্যাফার পরজীবী মাছিগুলো মাসকয়িডিয়া দলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার 'মাস্‌সিডি' পরিবারের সদস্য- ঘরের মাছি আমাদের সবার চেনা। এই গোষ্ঠীভুক্ত মাছিগুলো চিকিৎসা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে বেশি পরিচিত। এরা রক্ত-চোষক প্রজাতিগুলো সরাসরি বা পোষক-মাধ্যম হিসেবে রোগ-জীবাণু বিস্তারের সহায়ক। কিছু মাছি আবার খোলা ক্ষত, চোখ বা খাদ্য সূত্রে রোগের অণুজীব ছড়ায়। তৃতীয়ত মাছির ম্যাগট (শুককীট) সংক্রমণে গবাদি-পশু ও অন্যান্য প্রাণীতে 'মাইয়াসিস' নামক মারাত্মক ব্যাধির কারণ।

Banglainternet.com

শিং মাছি ও আন্তাবল মাছি : এই দু'ধরনের মাছিই 'মাসসিডি' পরিবারের সদস্য। এই দু'টি মাছি প্রজাতি দেখতে অনেকটা এক রকমের। এগুলো ছোট, কালো

এবং আকারের দিক দিয়ে সাধারণ ঘরের মাছির প্রায় অর্ধেক। এদের মুখাংশ কামড়ানো ও চোষনের উপযোগী। শিং মাছি মানুষকে সহসা আক্রমণ না করলেও গবাদি-পশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পতঙ্গ। এক জরিপে দেখা গেছে, পশুপ্রতি এ ধরনের চার হাজার মাছি রয়েছে। এই মাছিগুলো রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা এদের পোষক দেহ খুঁচিয়ে রক্ত টেনে নেয়। সাধারণত এরা দিনে দু'বার রক্ত খায়। আমেরিকায় ১৯৪৫ সনের এক হিসাবে দেখা গেছে, এই পরজীবী মাছির আক্রমণের কারণে ৮৬ কোটি পাউন্ড মাংস বিনষ্ট হয়েছে।

আস্তাবলের মাছি 'কামড়ানো ঘরের মাছি' নামেও পরিচিত। এদের স্ত্রী-পুরষ উভয় ধরনের মাছি ঘোড়া, ভেড়া, গবাদি-পশু ও মানুষের রক্ত খায়। এদের মুখাংশ সুগঠিত (চিত্র-৭)। এদের বিরক্তিকর আক্রমণের দরুণ গো-মাংস ও দুধ উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকে।

স্ত্রী শিং মাছি প্রধানত গোবর-সারে ডিম দেয়। ডিম ফোটার উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৪-২৬° সেন্টিগ্রেড। প্রায় ২৪ ঘন্টায় ডিম ফুটে শূককীট বেরিয়ে আসে। শূককীট ৪/৫ দিনের মধ্যে মূককীটীয় পর্যায়ে যায়। এর সপ্তাহখানেকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মাছিতে পরিণত হয়। শিং মাছি দলের উল্লেখযোগ্য প্রজাতি 'সাইফনা ইরিট্যান্স'।

চিত্র-৭ আস্তাবল মাছি।

অন্যদিকে স্ত্রী আস্তাবল মাছি মল অথবা জৈব আর্বজনায় ডিম দিয়ে থাকে। মলমূত্র মিশ্রিত খড় ও আবর্জনা এই মাছির শূককীটের আদর্শ আবাসস্থল। ডিম তাপমাত্রা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে ১-৭ দিনের মধ্যে ফুটে। শূককীট উদ্ভিদভোজী। শূককীট থেকে মূককীট অবস্থায় যেতে সময় নেয় ৫-১৫ দিন। এই দলের উল্লেখযোগ্য গণ-'স্টমক্সিস'। এর প্রজাতি ঘোড়ার সংক্রামক ব্যাধি-সংঘটক ভাইরাসের বাহক। এগুলো মোরগ-মুরগির বসন্ত ও 'অ্যানথ্রাক্স' রোগের ব্যাকটেরিয়ার যান্ত্রিক বাহক। এছাড়া ঘোড়া ও গবাদি-পশুর কতিপয় 'ট্রাইপ্যানোসোমা' প্রজাতির বাহক হিসেবেও এদের পরিচিতি রয়েছে।

ঘরের মাছি : এগুলো 'মাস্কা ডোমেস্টিকা' নামে পরিচিত। কোন কোন অঞ্চলের শতকরা ৯৯টি মাছি এ জাতীয়। পরিবার 'মাস্সিডি'-এর অন্যান্য সদস্যের মতো ঘরের মাছি কামড়াতে পারে না। তথাপি আমাদের চারপাশের এই মাছিগুলোর অবস্থান জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এগুলো পঁচা খাদ্যদ্রব্য

BanglaInternet.com

মলমূত্র-আবর্জনায় বিচরণ-স্বভাবের দরুন রোগজীবাণু বহন ও বিস্তৃতির সুযোগ পায়। এগুলো স্বভাবতই বেশ কিছু পরজীবী রোগজীবাণুর বাহক।

ঘরের মাছির পাখার শিরাবিন্যাস বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বুক ও উদরের রঙ এবং সেখানকার লম্বালম্বি দাগ দেখে এ প্রজাতিকে সহজে চেনা যায়। এগুলো খাওয়ার সময় নিজের লালাগ্রন্থি নিঃসৃত রস দ্বারা এদের খাবার তরল করে গুছিয়ে নেয়।

স্ত্রী মাছি ঘোড়ার মল, গোবর-সার, শূকর ও মোরগ-মুরগির মলে ডিম দেয়। এছাড়া এগুলোকে যে কোন জৈব আবর্জনায় ডিম দিতে দেখা যায়। সাধারণত ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডিম ফুটে মাছির 'ম্যাগট' বা শূককীট বেরিয়ে আসে। মূককীট শূককীটে পরিণত হতে ৩ বার খোলস বদলায়। তৃতীয় পর্যায়ের শূককীট মাটি খুঁড়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এরপর এরা ত্বকের নিঃসৃত যৌগের সাহায্যে বাদামী মূককীট থলে তৈরি করে। শূককীটীয় পর্যায় ৪-৭ দিন স্থায়ী হলেও মূককীট পর্যায় দীর্ঘ হতে পারে। তা ২৫ দিন পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

মাছির শূককীট পর্যায় জীবজন্তুর বিষ্ঠা বা মলে বেড়ে উঠার সময় অনেক পোষক প্রাণীর পরজীবীর ডিমও এগুলো খেয়ে ফেলে। এভাবে এই মাছি নানা জাতের হেলমিন্থিস, বিশেষ করে বিভিন্ন কৃমি ও নেমাটোডার মধ্য-পোষক। মানুষের যক্ষ্মা, টাইফয়েড, আমাশয়, ভাইরাসঘটিত পলিয়োমায়লাইটিস, কলেরা, অ্যানথ্রাক্স প্রভৃতি রোগ-জীবাণু ঘরের মাছি দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

ভন্ ভন্ মাছি ঃ ক্যালিফোরিডি পরিবারের অধিকাংশ মাছি ভন্ ভন্ মাছি বা ব্লো-ফ্লাই নামে পরিচিত। এগুলো আকারে ঘরের মাছির চেয়ে কিছুটা বড়, দেখতে ধাতব-নীল কিংবা সবুজ রঙয়ের। ঘরের মাছির মতো এই মাছিগুলোও নানান রোগের যান্ত্রিক বাহক। কাজেই উপযুক্ত আবহাওয়ায় এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে আমাদের রোগ-বালাইয়ের প্রকোপও বেড়ে যায় নিঃসন্দেহে।

এই পরিবারের মাছিগুলোর মধ্যে গণ - 'লুসিলিয়া', 'ফরমিয়া' এবং 'ক্যালিফোরা'-এর যথেষ্ট জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এগুলোকে এদের দেহ রঙয়ের কারণে 'গ্রীন বটল' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদের স্ত্রী-মাছি সাধারণত মেষের গায়ের ঘা, মৃতদেহ কিংবা পরিত্যক্ত পশমে ডিম পাড়ে। দেশজ প্রজাতি 'লসিলিয়া' কুপরিনা' আমাদের উপকূল অঞ্চলে রোদে দেয়া শুট্‌কী মাছে যে সংক্রমণ ঘটায় তা শুট্‌কি ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মাছিগুলো আধা শুকনো, আধা গলিত মাছের জায়গায় জায়গায় ডিম পাড়ে এবং তা অল্পক্ষণের মধ্যে শূককীটরূপে বেরিয়ে আসে। গলিত মাছের রসে এরা সহজে বেড়ে উঠে। তৃতীয় পর্যায়ের শূককীট মাটিতে শূককীটাবস্থায় যায়। একইভাবে 'ক্যালিফোরা ইরিথ্রোসেফালা' 'ব্লু-বটল' নামে পরিচিত। এটির পাখা বিন্যাস ও

BanglaInternet.com

পুঞ্জাক্ষির গন্ডদেশের লাল রঙ দেখে প্রজাতিটি চেনা যায়। এদের শূককীটও নোংরা, ঘা ও পঁচা জৈব পদার্থে বসবাস করতে পছন্দ করে।

সেট্‌সি মাছি : এই মাছি গ্লসিনিডি পরিবারের অধীনে উপপরিবার মাসসিডি-এর আওতাভুক্ত। এটি একটি রক্তচোষক মাছি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার মাছিই নানা ধরনের প্রাণীর রক্ত খেয়ে জীবন ধারণ করে। এই মাছি মাঝারি আকারের এবং দেহের রঙ হলদে থেকে গাঢ় বাদামী রঙয়ের। অবস্থানকালে এদের পাখা কাচির মতো বা গুণন চিহ্নের মতো হয়ে থাকে। এদের মুখাংশ কর্তন ও চোষনোপযোগী। সেট্‌সি মাছির মাথায় ২টি বড় পুঞ্জাক্ষী ও তিনটি ক্ষুদ্রাক্ষী রয়েছে (চিত্র-৮) এদের শুঙ্গ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

চিত্র-৮ সেট্‌সি মাছি।

সেট্‌সি মাছি ডিম না দিয়ে সরাসরি পরিণত শূককীট প্রসব করে। এদের তখন বলা হয় 'ফ্যারেট শূককীট'। এগুলো তৃতীয় পর্যায়িক মূককীট হিসেবে মাতা মাছির দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। ছায়াঘেরা জায়গায় নরম মাটিতে শূককীটগুলো তখন অবস্থান নেয়। শূককীটের পা নেই তবে শ্বসন-অঙ্গ বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। মুক্ত জীবন-যাপনকারী শূককীট আহার করে না। তৃতীয় পর্যায়ের শূককীট ঘন্টাখানেক সময় সক্রিয় জীবন-যাপন করে দ্রুত মাটি খুঁড়ে কয়েক সেন্টিমিটার নিচে ঢুকে এবং শূককীট অবস্থায় চলে যায়। এই অভ্যন্তরীণ অবস্থায়ই আবার একাধিকবার শূককীটীয় খোলস বদলায়। এরপর পূর্ণাঙ্গ মাছি মূককীটীয় খোলস কেটে বেরিয়ে আসে। মূককীটীয় অবস্থা থেকে পরিণত মাছিরূপে বেরিয়ে আসতে ২০ থেকে ৯০ দিনের মতো সময় লাগে। পূর্ণাঙ্গ মাছি খোলস থেকে বেরিয়ে এলেই সঙ্গমে সক্ষম হয়। স্ত্রী মাছির জীবনে একবার মাত্র যৌনমিলন ঘটে। পুরুষ থেকে বাহিত শুক্র স্ত্রী মাছির শুক্রথলি বা শুক্রধাণীতে সংরক্ষিত থাকে। গড়ে প্রতি তিনদিন থেকে পাঁচদিন পরপর এরা রক্ত খায়। প্রকৃতিতে স্ত্রী সেট্‌সি মাছি ৬-১৫ সপ্তাহ এবং পুরুষ মাছি ৪-৮ সপ্তাহ বেঁচে থাকে।

'গ্লসিনা' গণভুক্ত ২০টি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে 'গ্লসিনা পালাপালিস' মারাত্মক গাম্বীয় ঘুম রোগের পরজীবী 'ট্রাইপেনোসোমা'-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাহক। এগুলো স্তন্যপায়ী প্রাণী, কুমীরজাতীয় সরীসৃপ ও বড় টিকটিকিরও রক্ত খেতে পছন্দ করে। 'গ্লসিনা মর্সিটান্স' মানুষের রোডেশীয় ঘুম রোগের পরজীবী এবং

BanglaInternet.com

জন্তু-জানোয়ারের নানান রোগ-সংঘটক পরজীবীর বাহক। এই মারাত্মক পরজীবী ও রোগ-বাহক পতঙ্গ দল আফ্রিকা মহাদেশেই সীমাবদ্ধ।

উকুন মাছি ঃ সাধারণভাবে উকুন মাছি নামের পরিচিত পতঙ্গগুলো হিপ্পোবস্‌সিডি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পাখাবিহীন গণ-'হিপ্পোবসকা' ঘোড়া, গবাদি-পশু, উট, কুকুর ইত্যাদিতে পরজীবী। এর কোন প্রজাতি বাসার প্রাণীকে আক্রমন করে। এছাড়া এর অন্য এক সদস্য কবুতরের পরজীবীর মধ্য-পোষক বলে জানা গেছে। এই পরজীবীগুলো পারতপক্ষে মানুষে ভর করে না। এদের কামড় বেশ যন্ত্রণাদায়ক।

এগুলোর দেহ ওপরে-নিচে চ্যাপ্টা। উদর বলের মতো এবং তাতে খন্ডাংশের বিভক্তি-রেখা খুব একটা চোখে পড়ে না। এদের মুখাংশ সেট্‌সি মাছির মতো যার কর্তনোপোযোগী প্রবোসিস রয়েছে। পাখাওয়ালা উকুন মাছির চোখ বড় ও শুঙ্গ উন্মুক্ত। এগুলো সেট্‌সি মাছির মতো পরিণত শূককীট প্রসব করে যা পরবর্তী মূককীট পর্যায়ে যাওয়ার জন্য প্রায় প্রস্তুত থাকে। এই মাছি শুকনো মাটি, পাখির বাসা কিংবা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থানে শূককীট প্রসব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই মাছি পোষক দেহের উল বা লোমে শূককীট ছেড়ে দেয়। হরিণের বেলায় এমনটা দেখা যায়। শীতে হরিণের লোম পরিবর্তনের সময় শূককীটগুলোও পড়ে গিয়ে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উষ্ণ আবহাওয়ায় তা পরিণত মাছি হয়ে নতুন পোষকের সন্ধান করে।

মাছির ম্যাগট ও 'মাইয়াসিস' সংক্রমণ ঃ আমরা সাধারণত পরজীবী বা বাহক কীটপতঙ্গ সম্পর্কে যখন আলোচনা করি, তখন তা পরিণত প্রাণীর সূত্রেই উথাপন করে থাকি। এদের কোন একটি পর্যায়কে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। তবে মাছির 'ম্যাগট' সংক্রমণ ও এর অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে কোন কোন মাছির 'ম্যাগট' বা শূককীট পর্যায় পরজীবীবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তা স্বতন্ত্রভাবেই। বিশেষ কোন মাছি যখন কোন প্রাণী বা পোষক দেহে ক্ষতিকর ঘা বা সংক্রমণ ঘটায় তখন তাকে 'মাইয়াসিস' বলে। 'মাইয়াসিস' সংঘটক সম্পর্কিত মাছিগুলোর প্রায় সবই উপবর্গ সাইক্লোর‍্যাফার সদস্য। এর মধ্যে পরিবার 'ক্যালিফোরিডি' (ভন্ ভন্) মাছি ও সার্কোফ্যাজিডি-এর ম্যাগটগুলো সাধারণত মৃত-পঁচা মাছ-মাংস খেয়ে থাকে। তবে সুযোগ বুঝে এগুলোই আবার জীবন্ত-পোষকের সন্ধানে বের হয় এবং প্রকৃতপক্ষে পরজীবী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন, স্ক্রু-ওয়ার্ম যখন মেষের চামড়ার নিচে সংক্রমণ ছড়ায়, তখন তা অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে।

পোষক দেহে ম্যাগট-সংক্রমণ বিভিন্ন ধারার হয়ে থাকে। রক্তচোষক, ক্ষত বা সাধারণ অবস্থানের সুরঙ্গ (যেমন, নাক, কান ইত্যাদি), উলের নিচের চামড়া, চামড়ার নিচের ফোড়া, অন্ত্র বা মূত্রনালী, মলাশয় ইত্যাদিতে নানা ধরনের আক্রমণের দ্বারা ম্যাগট পোষক দেহের উল্লেখযোগ্য রোগ সৃষ্টি ও ক্ষতিসাধন করে।

BanglaInternet.com

রক্তচোষক ম্যাগটের মধ্যে কেবল কঙ্গো-ফ্লোর ম্যাগট মানুষের রক্ত চুষে নেয়। এগুলো আফ্রিকার সাহারার মরু-অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। এছাড়া এগুলো পাখি ও কম লোমওয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণীতেও রক্তচোষক পরজীবী।

ক্ষত-ঘা বা পোষক দেহের স্বাভাবিক ছিদপথে যে সকল মাছির ম্যাগট দ্বিতীয় পর্যায়িক (সেকেন্ডারী) সংক্রমণ ঘটায় এর মধ্যে গণ- 'ক্যালিফোরা', 'ফোরামিয়া', 'স্নাইসমিয়া', 'সারকোফ্যাগা' উল্লেখযোগ্য। এগুলো সাধারণত জীবন্ত কোষকলাকে আক্রমণ করে না। বরং পচনশীল অবস্থায় এগুলো বেশ কার্যকর।

অন্যদিকে স্ক্রু-ওয়ার্ম মাছি জীবন্ত কোষকলায় পরজীবী। এগুলো প্রধানত গবাদি-পশু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীকে আক্রমণ করে। এসব প্রাণীর শতকরা ৯০ ভাগ সংক্রমণ হয় এই মাছি দ্বারা। এর ফলে আমেরিকায় বছরে কোটি কোটি ডলারের বাণিজ্যিক ক্ষতি হয়ে থাকে।

উল ম্যাগট অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিল্যান্ডে মেষ উৎপাদনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

বটমাছি ঃ চামড়া-বট, মাথা-বট, ঘোড়া-বট, ইত্যাদির ম্যাগট নানা জাতের জীবজন্তু ও মানুষকে আক্রমণ করে এদের সংক্রমণে যে বিরক্তি ও নানামুখী ক্ষয়ক্ষতি হয় উন্নত বিশ্বে এর নির্ভরযোগ্য যে পরিসংখ্যান আমরা পাই তাতে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা, 'মাইয়াসিস' উৎপাদনকারী উল্লেখযোগ্য গণের (ক্যালিফোরিডি/সারকোফ্যাজিডি) বেশ কিছু সদস্য প্রজাতি আমাদের এখানেও আছে। তবে এদের দ্বারা ক্ষয়-ক্ষতি বা সংক্রমণ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক জরিপ আমাদের এখানে খুব একটা হয়নি বলে ধারণা করা হয়।

একটি কালো মাছি।

Banglainternet.com

শ্রেণী—অ্যারাকনিডা

এই শ্রেণীর প্রাণীকুল সাধারণভাবে মাকড়সা নামে পরিচিত হলেও এখানে সব ধরণের মাকড়সা, বৃশ্চিক, আঠালী ও মাইট রয়েছে। এদের পরিণত সদস্যের চার জোড়া পা, দুই জোড়া মুখাংশ (চেলিসেরা ও পাল্পী) থাকে। এগুলোর শুঙ্গ অনুপস্থিত এবং মাথা ও বক্ষ একত্রিত হয়ে সেফালোথোরাক্স গঠন করেছে। অনেক প্রজাতির বেলায় (মাইট/আঠালী) নির্দিষ্ট উদর থাকে না।

অ্যারাকনিডা শ্রেণীর ৮টি বর্গের মধ্যে কেবল অ্যারাকনিডা-তে পরজীবী ও জীবাণু বাহক সদস্য রয়েছে। উপবর্গ অ্যাকারিনা-এর সদস্যগুলো সাধারণভাবে ক্ষুদ্র মাকড় বা মাইট্স ও আঠালী/আটুলী (টিকস্) নামে পরিচিত।

ক্ষুদ্র মাকড় বা মাইট ঃ অনেক মাইট বা ক্ষুদ্র মাকড় মুক্তজীবী। এগুলো পচনশীল দ্রব্য, শাক-সব্জি, সংরক্ষিত খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। কিছুসংখ্যক পরভোজী প্রজাতিও রয়েছে যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ধরে খায়। জলজ বা সামুদ্রিক মাকড়গুলো অন্য প্রাণীতে পরজীবী। এই সদস্যগুলোর কোন কোনটি এদের জীবন-চক্রের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ সময় পরজীবী জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত। এরমধ্যে কিছু আবার মারাত্মক রোগ-বালাইয়ের বাহক। অন্যদিকে এগুলো কোন কোন প্রোটোজোয়া ও হেলমিন্থিস পরজীবীর মধ্য-পোষক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাইটগুলো আকারে বেশ ছোট। খালি চোখে অনেক সময় ধরা পড়ে না। এদের জীবন-চক্রে চারটি পর্যায় রয়েছে। যথা, ডিম, শূককীট, নিম্ফ ও পরিণত অবস্থা। সাধারণত এরা মাটির নিচে, দেয়ালের ফাটলে কিংবা পোষক প্রাণীর চামড়ার নিচে ডিম দিয়ে থাকে। আবার এদের কিছুসংখ্যক প্রজাতির ডিম, ভ্রূণ ও বাচ্চা মা-মাইটের পেটে বেড়ে ওঠে। সরাসরি ডিম দেয়া প্রজাতিগুলোর নির্দিষ্ট উদ্ভিকাল পাড় হয়ে গেলে ডিম থেকে ৬ পা-বিশিষ্ট শূককীট বের হয়। একটি পূর্ণ খাবার গ্রহণের পর কোন কোন প্রজাতি কয়েকবার খোলস বদলিয়ে ৮ পা-বিশিষ্ট নিম্ফে পরিণত হয়। মাইট আকারে ছোট বলে এদের বিস্তৃতির সহজ কৌশল রয়েছে। এগুলো প্রধানত পরজীবিতার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা (জলচর মাইটসহ) কীটপতঙ্গ দ্বারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাহিত হয়ে যায়।

দৃশত মাইট বহিঃপরজীবী হলেও এদের অন্তঃপরজীবীর সংখ্যাও কম নয়। এগুলোকে স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সাপের ফুসফুস ও বায়ুথলীতে বসবাস করতে দেখা যায়। মানুষের মূত্রথলিতে এগুলো বংশবিস্তার করে বলে জানা গেছে। তবে মানুষের

Banglainternet.com

বেলায় এগুলো সাধারণত বহিঃপরজীবী বা অধঃত্বকীয়। পরজীবী মাইটের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য।

চুলকানি ও খোস-পাঁচড়া মাইটঃ এগুলো আকারে ছোট, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি। এই মাইটগুলোর পা ছোট ও চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। এগুলো পরিবার-সারকপটিডির অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারের সদস্যগুলো মানুষের খোস-পাঁচড়া, চুলকানি জাতীয় চর্মরোগ সৃষ্টি করে। পরিবার-সরোটিডি-তেও একই ধরনের প্রজাতি রয়েছে যেগুলো কুকুর, শিয়াল, বিড়াল, ইঁদুর, ঘোড়া এবং শূকরে অনুরূপ বিরক্তিকর চর্মরোগের কারণ।

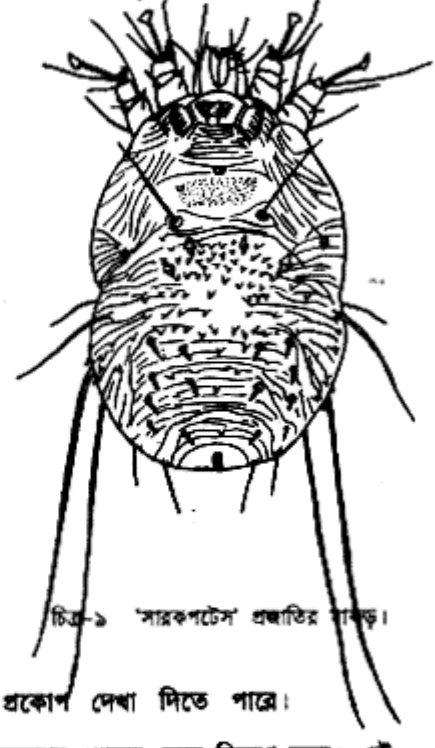

চিত্র-৯ 'সারকপটেস' প্রজাতির মাইট।

মানুষে সংক্রমণকারী 'সারকপটেস স্কেবিয়াই' (চিত্র-৯) আকারে ছোট ও দেখতে সাদা। সাধারণত খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এদের গায়ে খাড়া, শক্ত কাঁটা বা লোম রয়েছে। এদের চোখ বা শ্বসননালী নেই। নিষিক্ত স্ত্রী চুলকানি মাইট নরম ও পাতলা ত্বকের ভিতর দিয়ে নালী করে চলাচল করে। দিনপ্রতি একটি স্ত্রী মাইট দু-চারটে করে ডিম পাড়ে এবং অনুমানিক ৩৫-৫০টি ডিম দিয়ে মারা যায়। শূককীট ২-৩ দিনের মধ্যে নিম্ফে পরিণত হয়। নিম্ফ চামড়ার নিচে নিজে নিজের নালী তৈরি করে নেয় এবং তাতে দু'বার খোলস বদলায়। এদের পূর্ণ পরিবর্ধনের সময়কাল ৮ থেকে ১৪ দিন। পরিণত মাইট ৪ সপ্তাহের মতো বাঁচে। এগুলোর সংক্রমণের ফলে সাধারণত মাথা ছাড়া শরীরের যে কোন অংশে এই চর্মরোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে।

এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলো নিশাচর এবং ঘুমন্ত অবস্থায় পোষক দেহে বিচরণ করে। এই রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে ভাল জানার আগে ধারণা করা হত—দূষিত রক্তের কারণে এই চর্মরোগ হয়। এক সময় এই রোগ সেনাবাহিনী ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে মহামারীরূপে দেখা দিত। তবে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের প্রকোপ কমে আসছে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যচর্চা করলে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে এই ধরনের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে এই রোগ বেশ ছোঁয়াচে।

BanglaInternet.com

চুলের ফলিকল মাইটঃ এই মাইটকে 'মুখমণ্ডল' মাইটও বলা হয়। এটি পরিবার 'ডেমোডিসিডি'-এর সদস্য। এগুলো সাধারণ মাইটের মতো না হয়ে লম্বাটে

ওয়ার্মের মতো হয়ে থাকে। এগুলো স্তন্যপায়ী প্রাণীর চুলের গোড়া ও ঘামমেদ গ্রন্থিতে বসবাস করতে দেখা যায়। মানুষের বেলায় এগুলো মুখমণ্ডল ও কানের ভেতরকার লোমে পরজীবী জীবন-যাপন করে। কুকুরের লসিকাগ্রন্থিও এদের বিচরণ ক্ষেত্র।

মাইটগুলোর মাথা খাটো ও প্রশস্ত। এদের পা ছোট ও তিন খণ্ডবিশিষ্ট। অন্যদিকে উদর যথেষ্ট লম্বা।

এখানকার উল্লেখযোগ্য প্রজাতি 'ডেমোডেক্স ফলিকুলরাম'। এদের বংশবিস্তার ধীর গতিতে হয়। এর শূককীট চারবার খোলস বদলিয়ে প্রজননক্ষম হয়। মানুষের চুলের গোড়ায়, বিশেষ করে নাসারন্ধ্রে এদের সংক্রমণের হার বেশি। এর আক্রমণে পোষক দেহের নির্দিষ্ট স্থান লাল হয়ে যায় এবং চুলকানির উদ্রেক হয়। কুকুরের বেলায় এই পরজীবী মাকড়ের আক্রমণ যথেষ্ট মারাত্মক ক্ষত-ঘায়ের সৃষ্টি করে থাকে। মূলত সংস্পর্শের দ্বারাই এর সংক্রমণ হয়। অনেকক্ষেত্রে এই সংক্রমণ পোষক দেহের সাধারণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে চর্মরোগের প্রকোপও কমে যেতে দেখা যায়।

লাল ঝাগ বা 'চিগার্স'ঃ এই পোকাগুলো পরিবার- ট্রম্বিকিউলিডি-এর সদস্য। এদের উপস্থিতি পোষক দেহে এমন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে তা ভাবাও যায় না। আর এই বিরক্তিকর পর্যায়টি হল, এর ৬ পা-বিশিষ্ট শূককীট।

এগুলোর নিম্ফ ও পরিণত সদস্য টুকটুকে লাল মখমলে ধরনের। ট্রম্বিকিউলিড মাইটগুলো মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পরজীবী। তবে এদের মুক্তজীবী পর্যায়ও রয়েছে। তখন এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ ও এগুলোর ডিমের ওপর নির্ভরশীল থাকে। মানব দেহে এই পরজীবী মাইট সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের বিশেষ টাইফাস রোগের জীবাণুও ছড়ায় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ম্যালেরিয়ার মতোই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এই মাইট রক্তক্ষরণ-জ্বর জীবাণুরও বাহক বলে অনুমান করা হয়।

স্ত্রী মাইট মাটিতে একটি একটি করে নয়ত গোছায় গোছায় ডিম পাড়ে। বাড়তে থাকা ভ্রূণের চারদিকে ঝৈল্লিক সিস্ট তৈরি হয়। এই আবরণের ভিতরেই এই নিম্ফগুলো ৮ পা পর্যায়ে যায়। নিম্ফ ও পরিণত মাকড় দেখতে একই রকম, তবে পরিণতটি শুধু আকারে বড় হয়ে থাকে। এদের দেহের লাল রঙ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এগুলো রক্তচোষক পরজীবী। আসলে তা নয়। এগুলো পোষক দেহের চামড়ার সঙ্গে সেটে থাকে এবং লালার সাহায্যে কোষকলায় সূক্ষ্ম ছিদ্র করে সেখানটায় ঢুকে পড়ে। চামড়ার নিচের সূক্ষ্ম নালীতে বসে বসে এই পরজীবী মাকড়গুলো অর্ধজীর্ণ কোষকলা শুষে নেয়। পরজীবিতা ও টাইফাস রোগের বাহক হিসেবে গণ- 'ট্রম্বিকিউলী'-এর প্রজাতিগুলো উল্লেখযোগ্য।

BanglaInternet.com

রক্ত-চোষক মাইটঃ এই রক্তচোষক মাকড়গোষ্ঠী 'ডার্মেনিসিডি' পরিবারভুক্ত। সাধারণত এগুলো ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও পাখিতে পরজীবী। এদের কিছু প্রজাতি

পাখির বাসায়, কিছু আবার পাখির দেহে বসবাস করে। এই মাকড় দলের দু'একটা প্রজাতি মানুষের 'স্পটেড ফিভার'-এর রোগ জীবাণু ছড়ায় বলে জানা গেছে। সেখানে ইঁদুর মধ্য-পোষক হিসেবে কাজ করে। ইঁদুরও এদের সংক্রমণে 'টুলেরেমিয়া' রোগে আক্রান্ত হয়।

এই রক্তচোষক পরজীবীগুলো দেয়াল/গাছের ফাঁক-ফোকড় বা পাখির বাসা ইত্যাদিতে ডিম দেয়। রাতের বেলায় এগুলো পোষক দেহ থেকে রক্ত চুষে নেয়। সময় সময় মোরগ-মুরগিতে এই আক্রমণ এমন ব্যাপক রক্তক্ষরণ ঘটায় যার ফলে পোষক প্রাণীর প্রাণহাণি ঘটতে দেখা যায়। এদের শূককীট পর্যায় অভূক্ত থাকে। তবে পরিণত অবস্থায় যেতে যেতে এই শূককীটগুলো বার দুই রক্তাহার করে থাকে। পরিণত স্ত্রী মাইটের ডিম দেয়ার সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক খাদ্য গ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে।

এই মাকড়গোষ্ঠীর অন্তঃপরজীবী সদস্যগুলো পাখির বায়ুথলি, ফুসফুস ও অভ্যন্তর ভাগের গহ্বরে বসবাস করে— যা সময় সময় পোষকের প্রাণনাশের হুমকিস্বরূপ দেখা দিতে পারে। 'ডার্মেনিসাস'-গণের প্রজাতিগুলোর পরজীবিতা গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্যদানার মাইটঃ এই দলের মাইটগুলো পরিবার 'অ্যাকারিডি' ও গ্লাইসাইফ্যাজিডি- এর অন্তর্ভূক্ত। মানুষের বাসস্থান, গোলাঘর, খাদ্যদ্রব্য ও সংরক্ষিত বীজ— এমনকি আসবাবপত্রের ফাঁক-ফোকড়ে এগুলো থাকে। মানুষ এদের সংস্পর্শে এলে অ্যালার্জীয় বিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। এছাড়া এদের দেহ, দেহাংশ, মরা চামড়া ও মল বিষাক্ত ধরনের। এসব খাদ্যসামগ্রীতে মিশ্রণের ফলে মানুষ সহজে সংক্রমিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে চামড়া ও শ্বাস-কষ্ট সংক্রান্ত অসুবিধা দেখা দেয়। চামড়ায় দাদ থেকে নিয়ে হাঁপানি, জ্বর, বমিবমি ভাব ও উদরাময় ইত্যাদি নানা উপসর্গে মানুষ আক্রান্ত হয়। এসবের উপদ্রব আমাদের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যায়। তবে এগুলো ছোট বলে এদের অনুসন্ধান খুব একটা হয়নি।

চামড়ায় যে সংক্রমণ হয় সে সকল সদস্যক 'মুদি দোকানী' বা 'রুটিওয়ালা' মাইট বলা হয়ে থাকে। এসব সংক্রমণ সবসময় মানুষে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তা মাইটসহ খড় খাওয়ার ফলে ঘোড়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। এসবের সাধারণ গণগুলো হচ্ছে, 'অ্যাকারুস', 'টাইরোফ্যাগাস' ও 'গ্লাইসাইফ্যাগাস'। প্রথম দু'টি গণ আকারে লম্বা এবং এদের দেহে খণ্ড বিভক্তির দাগ টানা ও পৃথকীকৃত। শেষোক্ত গণটির সেই ধরনের বিভক্তি নেই।

এই মাইটগুলো নিষ্ক্রীয় পর্যায়ে এসে এক ধরণের ভ্রাম্যমান স্বভাবের হয়ে পড়ে। এদের তখন কোন মুখাংশ থাকে না, পা খাটো এবং উদরে অঙ্কীয় চোষক রয়েছে। এই অবস্থায় এগুলো কীটপতঙ্গ বা অন্য কোনকিছু বাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। বাহক দেহ থেকে পড়ে গিয়ে এগুলো ৮ পা-

BanglaBook.org

বিশিষ্ট নিম্ফ পর্যায়ে যায় এবং খাওয়ার পর পরিণত অবস্থায় পৌঁছে।

প্রথমত এগুলো খাদ্যশস্য, খড়, তুলো, বীচির ক্ষতিকর কীটপতঙ্গে পরজীবী। তবে এদের খাদ্য ও পোষক দেহের অভাব দেখা দিলে তা সময়-সুযোগ বুঝে মানুষেও সংক্রমিত হয়।

আঠালী বা টিক্‌স: এই পরজীবী প্রাণীগুলো আকারে বড় ও উপবর্গ ইক্সোডিডি-এর সদস্য। উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীসমূহের অধিকাংশেই আঠালী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই জাতের মাকড়সার অপ্রাপ্ত বয়স্ক থেকে পূর্ণাঙ্গ সকল স্তর পোষক দেহ থেকে রক্ত চুষে খায়। আঠালী বা টিক্‌স ২টি পরিবারে বিভক্ত। যথা, আর্গাসিডি' (নরম দেহী) আঠালী ও 'ইক্সোডিডি' (শক্তদেহী আঠালী)। এই দু'টি পারিবারের আকৃতি ও জীবন-চক্রে তফাৎ রয়েছে।

সকল আঠালী এদের জীবন-চক্রের কোন না কোন পর্যায়ে পরজীবী। এসবের বেশির ভাগ সদস্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এবং কিছুসংখ্যক প্রজাতি পাখি ও অন্যান্য অনুষ্ণশোনিত প্রাণীতে ভর করে বাঁচে। কোন একটি পরজীবী এদের জীবন-চক্রে পোষক দেহ পরিবর্তন করতে দেখা যায়। যেমন, এর শূককীটীয় পর্যায় ছোট পোষক প্রাণীতে এবং একই পরজীবীটির পরিণত অবস্থা বড় স্তন্যপায়ীতে বেড়ে ওঠে বলে জানা গেছে। এই পরজীবী আঠালীর মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুতে বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু পরিবাহিত হয়।

চিত্র-১০ 'বুয়োফিলাস' প্রজাতি (ডিমসহ)।

নরমদেহী আঠালী বা 'আর্গাসিড' টিক্‌স-এর শূককীট ও পরিণত অবস্থা বারবার খাদ্য গ্রহণ করে এবং স্ত্রী মাকড়সা মাসাধিককাল ধরে গোছায় গোছায় ডিম দেয়। অন্যদিকে শক্তদেহী আঠালী বা 'ইক্সোডিড' স্ত্রী পোষক দেহ থেকে একবার মাত্র ভর পেট খায় এবং পোষক দেহের বাইরে একবারে কয়েক হাজার থেকে ১৮ হাজার পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে (চিত্র-১০)। এসব ডিমের উদ্ভিকাল ২/৩ সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে। এদের শূককীট ৬ পা-বিশিষ্ট। 'ইক্সোডিড' শূককীটগুলো অধীর আগ্রহ নিয়ে উপযুক্ত পোষকের জন্য অপেক্ষা করে। মোটামুটি একটা পোষক পেয়ে গেলে খোলস পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ৮ পা-বিশিষ্ট নিম্ফীয় পর্যায়ে চলে যায়। এগুলো তখন প্রজননক্ষম থাকে না। তবে তখন এরা প্রধান বা চূড়ান্ত পোষক ধরে ফেলতে পারলে প্রজননক্ষম পরিণত অবস্থায় চলে যায়। তবে এদের জীবন-চক্রের যথেষ্ট ব্যতিক্রমও রয়েছে।

Banglainternet.com

আর্গাসিডি পরিবারের উল্লেযোগ্য গণগুলো হচ্ছেঃ 'আর্গাস', 'অটোবিয়াস', 'অর্নিথোডোরস' ইত্যাদি।

গণ 'আর্গাস'–এর সদস্য প্রধানত পাখি ও বাদুরে পরজীবী। এর প্রজাতি 'আর্গাস পার্সিকাস' মোরগ–মুরগির, মারাত্মক' পরজীবী। এগুলো মোরগ–মুরগির 'রিল্যাপসিং ফিবার', 'র‍্যাঞ্চ প্যারালাইসিস', পিরোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি সংক্রমক রোগ–জীবাণু ছড়ায়। কবুতরের আঠালী মানুষকেও আক্রমণ করে বলে জানা গেছে।

গণ 'অর্টোবিয়াস'–এর প্রজাতির কীটাওয়ালা শূককীট গৃহপালিত জীব–জন্তু ও শিশুদের কানে দীর্ঘদিন এঁটে থেকে রক্ত চুষে খায়। উপযুক্ত সময়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে ডিম দিয়ে থাকে। এ সময়ে এদের খাবারের প্রয়োজন হয় না।

গণ 'অর্নিথোডোরস্'–এর সদস্যগুলো সাধারণত ডিম্বাকারের। তবে এদের রকমফেরও রয়েছে। এগুলো প্রধানত স্তন্যপায়ী প্রাণীর আঠালী। কতগুলো প্রজাতি ইঁদুরে বা ছোট স্তন্যপায়ীতে বসবাস করে। তবে কতগুলো আবার মানুষ ও গৃহপালিত জীব–জন্তুতে পরজীবী। কতগুলো বাদুরেও সংক্রমিত হয়।

কিছু কিছু 'ইক্সোডিড' প্রজাতি মিলনের আগে খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হলেও মিলনের সময় খাদ্যগ্রহণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এসব প্রজাতির কোন কোন স্ত্রী সদস্য পোষক দেহ পরিবর্তন করার আগে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ আঠালী পরজীবী নয় এবং আকৃতিতে স্ত্রীর চেয়ে ভিন্ন ধরনের। এ দলের পুরুষগুলো মিলনের পরপরই মারা যায়। এসব আঠালী এদের জীবন–চক্রের বেশিরভাগ সময় পোষক দেহ ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করে। যেমন, 'অ্যাম্লোডেস রেসিনাস'–এর ৩ বৎসরের দীর্ঘ জীবনের মাত্র ৩ মাস পোষক দেহে বিচরণ করে থাকে। জীবন–চক্রের বাকী সময় অন্য ধরনের জীবনযাপন করে। এদের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিতে এ ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কিছু আঠালী আবার স্বজনি বা পারথেনোজেনেটিক প্রজননে অভ্যস্ত।

যেমন, কোন ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে দুইটি নিষ্ক্রীয় পর্যায় থাকে। কিংবা এদের খোলস বদলের গ্যারান্টি কখনো এক পোষকে, আবার তা দ্বিতীয় পোষক দেহেও তাগাতাগি করে হয়। ইক্সোডিড শূককীট এক বছরের বেশি সময় খাবার ছাড়া বাঁচতে পারে। এদের পরিণত অবস্থাও দীর্ঘ অনাহারে অভ্যস্ত।

ইক্সোডিড পরিবারে ১২ টির মতো গণ রয়েছে। এর পোটা পাঁচেক গণ আমাদের দেশেও যথেষ্ট বিস্তৃত। এগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এরমধ্যে 'বুয়োফিলাস', 'হেমাফাইসেলিস', 'রিপিসেফালাস' ও 'হায়ালোম্মা' বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

'বুয়োফিলাস' গণের ৩টি প্রজাতি এক পোষক–জাত এবং এগুলো প্রধানত গবাদি–পশুতে পরজীবী। 'বুয়োফিলাস মাইক্রোপ্লাস' আমাদের দেশের গরু–ছাগলের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এগুলো পোষক দেহে বিরক্তির উদ্রেক, রক্তচোষণ থেকে নিয়ে নানা ধরনের রোগ–জীবাণু ছড়ায় ও সময় সময় গবাদি–পশুর মরক ডেকে আনে।

BanglaInternet.com

'হেমাফাইসেলিস' গণের প্রজাতিগুলো আমাদের দেশেও বেশ বিস্তৃত। এগুলো ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখিতে পরজীবী। এগুলো এক পোষক দেহ থেকে অন্য পোষক দেহে বিভিন্ন ধরনের টাইফাস রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে থাকে।

'রিপিসেফালাস'- গণের প্রজাতির সংখ্যা ৪৬টির মতো। সাধারণভাবে এগুলোকে 'বাদামী আঠালী' বলা হয়। এদের পোষক খুব নির্দিষ্ট নয়। বিশেষ করে, নানা জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এদের বিস্তার। এগুলো মানুষ বাদ দিয়ে অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীতে ভর করতে বেশি পছন্দ করে। আমাদের দেশে এদের বিস্তার গৃহপালিত জীব-জন্তুতে মোটামুটি সীমাবদ্ধ বলে জানা যায়।

'হায়ালাম্ম' গণের প্রজাতিগুলো মূলত বড় স্তন্যপায়ীতে পরজীবী। তবে এদের অপরিণত অবস্থা পাখি, ইঁদুর ও খরগোশে বেড়ে উঠে। এগুলো যে সকল রোগ-জীবাণু ছড়ায় এরমধ্যে রিকেটসিয়াস ও অন্যান্য ভাইরাসঘটিত রোগ-জীবাণু বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এসব ক্ষেত্রে এদের মধ্যে-পোষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রেণী—ক্রাসটেসিয়া

এই শ্রেণীর প্রাণীগুলোর বেশির ভাগ জলচর। জলে এদের বিস্তৃতি এমন ব্যাপক যে, স্থলভাগের কীটপতঙ্গ দলই কেবল এদের সমপর্যায়ভুক্ত বা তুলনীয়। চিংড়ি ও কাঁকড়া এ দলের জনপ্রিয় উদাহরণ। এ ছাড়াও এখানে ছোট বড় অনেক প্রজাতি রয়েছে। সাধারণত এগুলোর দুই জোড়া শুঙ্গ, এক জোড়া চোয়াল এবং দুই জোড়া বৈঠার মতো উপাঙ্গ রয়েছে। দেহ খণ্ডবিশিষ্ট হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা অস্পষ্ট। মাথা ও বক্ষ একত্রে শিরঃবক্ষ বা সিফালোথোরাক্স-এ পরিণত হয়। এদের শূককীট পরিণত অবস্থা থেকে দেখতে বেশ ভিন্ন ধরনের। এদের রূপান্তর কীটপতঙ্গের মতো সম্পূর্ণ নয়। এ দলের সদস্যের স্ত্রী-পুরুষ পৃথকীকৃত।

পরজীবিতার সূত্রে এই প্রাণীদল হেলমিন্থিসের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এখানে বেশ কিছু পরজীবী সদস্য রয়েছে। এই শ্রেণীর বেশির ভাগ সদস্য যেখানে জলজ মাধ্যমে জীবন-যাপন করে, সেখানে এদের পরজীবী সংক্রমণও জলজ প্রাণীতেই হয়ে থাকে। এই দলের পরজীবী সদস্যগুলো সব ধরনের প্রাণীতে ভর করলেও ওয়ার্ম, শামুক-ঝিনুক এবং নানা জাতের মাছকে এরা সহজে আক্রমণ করে। এগুলো আবার যেহেতু অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর খাদ্য, সেইহেতু এই জাতের পরজীবীগুলো উচ্চতর প্রাণী, বিশেষ করে সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী এমনকি মানুষের বেশ কিছু পরজীবীর মধ্য-পোষক হিসেবে কাজ করে। এগুলো এর সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক রোগ-জীবাণুরও বাহক। এই সকল পরজীবী সদস্য ৬টি বর্গে বিস্তৃত হলেও ৪টি বর্গের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। পরজীবিতার সূত্রে উল্লেখযোগ্য বর্গগুলো হচ্ছেঃ কোপেপোডা, ব্রাঙ্কিয়ুরা, সিরিপেডিয়া ও ম্যালাকস্ট্রাকা।

BanglaInternet.com

কোপেপোডা ঃ এগুলো আকারে ছোট, ১৬ খন্ডবিশিষ্ট এবং এদের ৫ জোড়া পা রয়েছে। অপরিণত অবস্থায় ৯টি পর্যায় থাকে। এই বর্গের গণ- 'হ্যামোসেরা' ওয়ার্ম-এ পরজীবী (চিত্র-১১)। অন্যদিকে 'মনস্ট্রিলা' গণের প্রজাতি শামুক-ঝিনুকে পরজীবী জীবন-যাপন করে। এর অন্যান্য গণ নানা ধরনের মাছের ফুল্‌কা ও অন্যান্য দেহখন্ডে পরজীবী। এই পোষক মাছের মধ্যে পাইক, কার্প, কড, শালমন, ট্রাউট, ছুরি ও সূর্য মাছ উল্লেখযোগ্য।

চিত্র-১১ একটি চিংড়িজাতীয় কোপেপড।

ব্রাঙ্কিয়ুরা ঃ এদের দেহ চ্যাপ্টা, শিরঃবক্ষ শিল্ড-আকারের, বুকে ৩টি মুক্ত ও ২ লোববিশিষ্ট অবিভক্ত খন্ড রয়েছে। এছাড়া এগুলোর ৪ জোড়া সাতারু-পা ও ২টি বড় পুচ্ছাক্ষী রয়েছে (চিত্র)-১২। পরিবার 'আরগুইলিডি'-এর সদস্য মাছের বহিঃপরজীবী। মাছের ফুল্‌কা-গহ্বর এদের পছন্দসই বাসস্থান। এই পরজীবীগুলো সহজে নোনা পানি থেকে মিঠা পানিতে অভিযোজিত হতে পারে। এসব স্বভাবের দরুণ মাছ ছেড়ে ব্যাঙাচীকেও পোষক হিসেবে বেছে নিতে সক্ষম। এদের পরভোজী স্বভাবও পরিলক্ষিত হয়। এখানকার উল্লেখযোগ্য গণ- 'আরগুইলাস'।

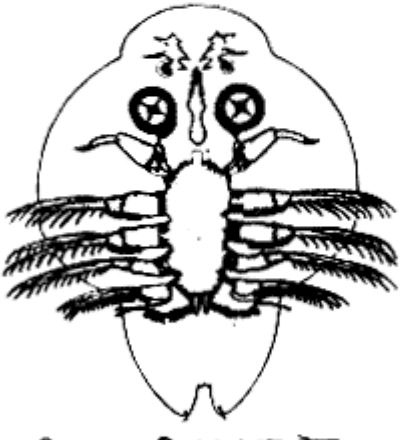

চিত্র-১২ একটি সাধারণ মাছ-উকুন।

সিরিপেডিয়া ঃ ক্ষয়মুখো বা ডিজেনারেটিভ রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য দিয়ে এ বর্গের পরজীবী সদস্যগুলোকে সহজে চেনা যায়। এগুলো মাথা ও লেজের সাহায্যে পোষকের দেহে এঁটে থাকে। এখানকার কোন কোন প্রজাতির আবার বোঁটার মতো উপাঙ্গ রয়েছে। এদের এক জোড়া পুচ্ছাক্ষী, ছয় জোড়া সাঁতারু পা, শুঙ্গ ও চোষক কলস থাকে। এর গণ 'চিলোনোবিয়া' কচ্ছপে এবং 'ডিচোলেসপিস' কাঁকড়া ও গলদা-

BanglaInternet.com

চিংড়িতে পরজীবী। অন্যকিছু প্রজাতি তিমি মাছের দেহে পরজীবী জীবন-যাপন করে থাকে। কিছু পরজীবী আবার সিলেনটেটা ও তারামাছ জাতীয় প্রাণীকে আক্রমণ করে। 'সাক্কুলিনা' এখানকার একটি পরিচিত পরজীবী।

ম্যালাকোস্ট্রাকা : এই দলের প্রাণীগুলোর ১৯ জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে। এরমধ্যে ৮ জোরা বুকে ও ৬ জোড়া উদরে অবস্থিত। এর পরজীবী উপবর্গগুলো হচ্ছে, আইসোপোডা ও অ্যাম্ফিপোডা।

আইসোপোডা : এগুলো চ্যাপ্টা ধরনের প্রাণী। এখানে বেশ কিছু মুক্তজীবী জলজ প্রাণী থাকলেও নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি দল পরজীবীতার জন্য উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হচ্ছে, ন্যাথিড্স, সাইমোথাইড্স এবং ইপিক্যারিডিয়াল।

পরিণত ন্যাথিড্স মুক্তজীবী ও আহার গ্রহণ করে না। রক্তচোষক পরজীবী হিসেবে এগুলো সামুদ্রিক মাছে এঁটে থাকে।

সাইমোথইড প্রজাতিগুলোর কিছু সদস্য মাছে পরজীবী হলেও অন্যান্য অমেরুদন্ডী প্রাণীতেও এদের সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এখানকার গণ- 'সাইমোথা' রক্তচোষক এবং লাল সামুদ্রিক মাছের ফুল্কার প্রকোষ্ঠ, মুখ ও ত্বকে পরজীবী।

ইপিক্যারিডীয় প্রজাতিগুলো অন্যান্য ক্রাসটেসিয়াতে পরজীবী। এদের পোষক নির্দিষ্টতা রয়েছে। এখানকার উল্লেখযোগ্য গণ হচ্ছে, 'ডানালিয়া' (ক্রাসটেসিয়াতে পরজীবী), 'বপিরাস' (গ্রেট চিংড়িতে পরজীবী) এবং 'পুরটুনিয়ম' (কাঁকড়াতে পরজীবী)।

আমরা জানি যে ভূ-মন্ডলের অধিকাংশে স্থান জুড়ে আছে জলাশয়। সীমাহীন জলের বিস্তার। এর জীবজ সম্পদেরও শেষ নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (মিঠা পানি ছাড়া) নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থাপনা ছাড়াই আমরা এর সম্পদ আহরণ করে থাকি। এই মাৎস্য ও অন্যান্য সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনার খুব একটা প্রয়োজন বোধ করি না। এর কারণ হয়ত-বা এই যে, এই সম্পদের বেশির ভাগ আপাতদৃষ্টিতে আমাদের চোখের আড়ালে থাকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই ক্রাসটেসীয় জলজ-প্রাণীকুলের পরজীবিতার জরিপ, এর ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারেও আমরা খুব একটা সজাগ নই। বিশেষ করে অনুন্নত বিশ্ব। অথচ এ দলের সহোদর প্রাণীদল ইনসেক্টা বা অ্যারক্নিডা সম্পর্কিত রোগ-বালাইয়ের প্রসঙ্গ বাদ দিলে — আমাদের গবাদি-পশু অর্থাৎ প্রাণীজ আমিষের যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়, ক্রাসটেসীয় পরজীবী মাৎস্য-সম্পদের ক্ষতি সেই তুলনায় কোন অংশে কম করে না—, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

BanglaInternet.com

পরজীবীর উৎস, অভিযোজন ও বিবর্তনধারা

সাধারণভাবে এটা আমাদের জানা আছে যে, শত শত কোটি বছর আগে পৃথিবী নামক গ্রহটির সূত্রপাত হয়েছিল। সেখানে জীবনের শুরু হয়েছিল আরও পরে। অর্থাৎ সহজতম ও ক্ষুদ্রতম প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন ছিল তা তৈরি হয়েছিল আরো অনেক সময়ের ব্যবধানে। জীবন সৃষ্টির তখনকার সেই উপযুক্ত পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবে আজকাল বিজ্ঞানীরা নানামুখী গবেষণা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর অনেক কিছু জানতে সক্ষম হয়েছেন। জানতে সক্ষম হয়েছেন, জীবন সৃষ্টির মৌলনীতিও।

পৌরাণিক আমলের গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা ছিল মাটি, পানি, আগুন ও বাতাসই জীবজগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান। এক অর্থে তা অনেকাংশে ঠিকও। এই উপাদানগুলো প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের নানাবিধ সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। আর একটা জিনিসও সহজভাবে ধরে নেয়া যায় বা তা যুক্তিসঙ্গতও বটে যে, পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত থেকেই পরজীবিতার উদ্ভব হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক—ভাইরাস। দেহ-আঙ্গিক গঠনের দিক দিয়ে এটি একটি সহজতম ও ক্ষুদ্রতম প্রাণী। প্রকৃতিতে এর স্বাধীন অবস্থান অনেকটা জড়বস্তুর মতো। এর অস্তিত্ব প্রকাশ, বংশবিস্তারের জন্য পোষক দেহের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ পোষক দেহ ছাড়া এগুলো জীবের গুণাগুণ প্রকাশ করতে পারে না।

অন্যদিকে এও আমাদের জানা আছে যে, আজকের পৃথিবীতে মানুষসহ যে লক্ষ কোটি উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে সেগুলো একদিনে বা এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণী হিসেবে উদ্ভব হয়নি। বরং তা হয়েছে কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে এবং একটি প্রজাতি থেকে আর একটি প্রজাতির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এইসব বাস্তব ধ্যান-ধারণা থেকে এও মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, জীবনের উৎস ও প্রজাতি থেকে প্রজাতি-বিভক্তির ইতিহাস যতদিনের— পরজীবিতার সূত্রপাতও হয়েছিল সেই সময় থেকে। কেননা, জন্মগতসূত্রে প্রকৃতির সকল জীব এক রকম দক্ষতা এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার একই রকম ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে জন্মায় না। জন্মাতে পারেও না। প্রত্যেকটি মানুষও তো একই রকমের স্বাস্থ্য, মেধা-চাতুর্য নিয়ে জন্মায় না। সেখানে প্রতিযোগিতায় একজন আর একজনের কাছে হেরে যায়। একজন আর একজনের নেতৃত্ব মেনে নেয়। মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পরজীবিতার উৎস বা সূত্রপাতের ব্যাপারটিও অনেকটা সে রকমের। তবে একটা কথা আমাদের মনে

BanglaInternet.com

রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানের জগতে শেষ কথা বলে কোন কিছু নেই। পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বক্তব্যের মতবিরোধ থাকবে। ভিন্ন ধ্যান-ধারণা থাকবে। এটা বিজ্ঞানের সত্য প্রকাশ, সচেতনতা ও গতিময়তার কারণেই প্রয়োজন। এই সকলের মধ্য দিয়েই সত্য অন্বেষণের ভিত দিন দিন মজবুত হতে থাকবে। অসত্য যাবে তলিয়ে।

দু'টি প্রাণীর পরস্পর নিরীহ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে এই স্বার্থপর পরজীবী সম্পর্কটি গড়ে উঠেছিল বলে ধরে নেয়া হয়। যার ফলে এক পক্ষকে এর পূর্ববর্তী খাদ্য ও অন্যান্য স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছে। এই পরিবর্তনটা একপক্ষের স্বার্থ উদ্ধারের খাতিরে সংঘটিত হয়— যা পোষকের সঙ্গে পরজীবীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে বলে ধরে নেয়া হয়। নির্ভরশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে পরজীবী-পোষক সম্পর্ক শুরুতে হয়ত ততটা নিগুঢ় ছিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা এমন পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, পরজীবী প্রাণীর পোষকের সাহায্য ছাড়া বাঁচা অসম্ভব হয়ে পড়ে।। এভাবে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পরজীবী ও পোষক প্রাণীর নামামুখী সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

প্রকৃতিতে পরজীবিতা আমরা কয়েকভাবে পেয়ে থাকি। যেমন বহিঃপরজীবী, অন্তঃপরজীবী ইত্যাদি। তবে এটা সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে, সকল পরজীবী আদিকালে কোন না কোন সময়ে মুক্তপ্রাণী হিসেবে এদের জীবনযাত্রা শুরু করেছিল। কালের পরিবর্তন ও প্রয়োজনের তাগিদে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন পোষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে। এই নির্ভরশীলতার যে নানা প্রকারভেদ রয়েছে তা আমাদের জানা আছে। যেমন, মশা ও ছারপোকার প্রয়োজনীয়তা এক ধরনের নয়। মশা মানুষ বা অন্য কোন প্রাণিদেহ থেকে একবার রক্ত চুষে নিতে পারলে সাময়িকভাবে এদের পরজীবী-নির্ভরশীলতা লোপ পায় এবং স্বাধীন জীবন-যাপন করে। আবার একই ধরনের পরজীবী উকুন পোষকের দেহে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বাস করতে দেখা যায়। এগুলো বহিঃপরজীবিতার পরিচিত উদাহরণ। অন্যদিকে এমনটা ধারণা করা হয় যে, আজকের কোন কোন পরজীবী প্রাণী জানা-অজানা পথে পোষকের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে অন্তঃপরজীবী প্রাণীতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে খাদ্যনালীর মাধ্যমে প্রথমত এগুলো পরিপাকতন্ত্রে স্থান পায় এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গে বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সেখানকার পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। এই ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত-প্রোটোজোয়ার জীবনচক্রে একাধিক পোষক জড়িত থাকতে দেখা যায়। প্রথম স্তরে এগুলো পতঙ্গের পরিপাক-নালীতে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত বা কোষকলায় তা নিজেদের গুছিয়ে নেয়। পতঙ্গের রক্তচোষণ স্বভাবের দ্বারা তা মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে বিস্তার লাভ করে।

BanglaInternet.com

পোষক দেহে পরজীবী প্রাণীর সম্পর্ক, প্রয়োজন ও নির্ভরশীলতার অস্বাভাবিকতার তাগিদে পরজীবী জীবটির আকৃতি-স্বভাব-চরিত্রেরও নানামুখী পরিবর্তন দেখা দেয়। সাধারণ একটি উদাহরণের দ্বারা ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে

যাবে। আমরা জানি যে, মুক্তজীবী নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সংজ্ঞাবহতন্ত্র, অঙ্গ বা সেন্স অর্গেন যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ও স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। এর কারণ, এগুলোকে প্রকৃতিতে সর্বক্ষণ খাদ্য-প্রতিযোগিতা, নানা প্রতিকূলতা, শত্রুমিত্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে সংজ্ঞাবহতন্ত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে পরজীবী প্রাণী যেহেতু পোষকের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে পরজীবীর প্রকৃতিতে টিকে থাকার সংগ্রাম মুক্ত পোষক প্রাণীর মতো তত কঠিন নয়। কেননা, এর জীবনধারণ, আত্মরক্ষা ইত্যাদি পোষক প্রাণী নিজের প্রয়োজনে করে থাকে। সুতরাং পরজীবী প্রাণীর সংজ্ঞাবহতন্ত্রের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হলেও তা হয় সংক্ষিপ্ত বা বিলুপ্ত ধরনের।

অভ্যন্তরীণ পরজীবী প্রাণীর বেলায় পরিপাক-নালী থাকতে পারে। আবার একেবারে নাও থাকতে পার। যেমন, ফিতাকৃমি, কাঁটামাথা-ওয়ার্ম এমনভাবে পোষকের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যায় যে, এদের নিজস্ব পরিপাক-নালীর প্রয়োজন হয় না বলে তা থাকেও না। এইসব পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পরজীবীকে পোষকের দেহ, পরিবেশ ও নতুন নতুন পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে টিকে থাকার প্রয়োজনে নানামুখী পরিবর্তন ও অভিযোজনের দরকার রয়েছে। তা এক অর্থে প্রাণীর বিবর্তনধারার রসদও বলা যায়। যেমন, মানুষ ও গৃহপালিত জীবজন্তুর বহিঃপরজীবী ফ্লীর দেহ দু'পাশে চ্যাপ্টা এবং এদের দেহ পেছনমুখী খাড়া কাঁটাসম্বলিত। এ ধরনের দেহ প্রাণীর দেহলোমের ভেতর দিয়ে চলাচলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। দেহটি যদি ওপরে-নিচে চ্যাপ্টা হত বা দেহকাঁটাগুলো সম্মুখগামী হত— তা হলে এদের চলাচলে এতটা সুবিধা হত না। এমনিভাবে অনেক পরজীবী প্রাণীর চক্ষু-বিলুপ্তি, স্পর্শন অঙ্গের অসম্পূর্ণতা, পাখাহীনতা, এমনকি পায়ের অনুপস্থিতিও পরজীবী প্রাণীর অভিযোজন বিশিষ্টতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। নানা ধরনের আকড়ি, হুল, চোষক, খনন-কর্তন মুখাংশ ইত্যাদিও পরজীবী প্রাণীর টিকে থাকার প্রয়োজনে সংযোজিত হয়েছে।

বংশবিস্তার ও প্রজন্মের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার উপর প্রাণিজগতের সাফল্য নির্ভর করে। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, যে প্রাণী যত সবল এবং বংশ/প্রজন্ম সংরক্ষণে বেশি পারদর্শী সেসব জীবের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা তত কম। পরজীবী প্রাণী স্বভাবতই দুর্বল এবং এগুলো এদের বংশের বিস্তার ও সংরক্ষণে তেমন পটু নয়। যার ফলে, এদের প্রজনন ও বংশ বিস্তারের বিধি-ব্যবস্থারও অভিযোজন হয়েছে। যেমন, যখন কোন পোষক দেহ ফ্লুক দ্বারা সংক্রমিত হয় তখন এই প্রাণীগুলো ধরে নেয় যে— এ পোষক প্রাণীটির মৃত্যু ঘটবে। মৃত পোষকে এদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। কাজেই এগুলো খুব দ্রুতগতিতে বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করে চলে— যাতে এদের বিলুপ্তি না ঘটে। এই সব পরিস্থিতি সম্ভাবনার সঙ্গে সংযোগ রেখে পরজীবী প্রাণীর প্রজননতন্ত্রেরও নানামুখী অভিযোজন হয়েছে। যেমন, ফিতাকৃমির অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ

BanglaBook.org

খন্ডের প্রতিটি খন্ডে যে, শুধু স্ত্রী ও পুরুষ প্রজননতন্ত্রের একেকটি একক বিদ্যমান তাই নয় বরং তাতে থাকে দু'জোড়া করে। অর্থাৎ দু'টি পুরুষ ও দু'টি স্ত্রী-প্রজনন তন্ত্রের সম্পূর্ণ ইউনিট রয়েছে। যাতে করে কোন কারণে যদি একটি অঙ্গহানি ঘটে তাতেও সেই খন্ডাংশটি প্রজননক্ষম রয়ে যাবে। আর সেসব পরজীবী প্রাণী যখন ডিম দেয় তখন তা হয় লক্ষের কোঠায়। এইসব বিবেচনায় এটা বিলক্ষণ বলা যায় যে, পোষকের দেহের বাইরের ও ভেতরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে পরজীবী প্রাণীর।

প্রাকৃতিক বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে পোষকের তুলনায় পরজীবীর কতগুলো সুবিধা রয়েছে। আমরা জানি যে, যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবজগতের সকল প্রাণী প্রজাতি থেকে গণ, পরিবার—এমনকি কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বর্গের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। পৃথক হয়ে গেছে। এবং তা পরিবেশ ও প্রকৃতির ক্রম-পরিবর্তন ও তাতে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়ার তাগিদেই হয়েছে। যেখানে তা হয়নি সেখানে নির্দিষ্ট প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। এমন দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রয়েছে।

প্রজাতি থেকে প্রজাতি উদ্ভবের তাড়নায় পোষককে যতটা পরিবর্তিত হতে হয়েছে পরজীবীর ততটা হয়নি। কেননা এই পরিবর্তনের সূত্রে অভ্যন্তরীণ অঙ্গের বা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন যেটুকু তা তুলনামুলকভাবে সমান্যই হয় বলে দেখা গেছে। সুতরাং এই সামান্য অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সঙ্গে সেখানকার পরজীবী প্রাণীটিকে খাপ খাইয়ে নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। যদি সেই পরজীবী প্রাণীটি তাতে অক্ষম হয় বা খাপ খাইয়ে নিতে না পারে তবে সেই প্রাণীটি প্রকৃতিতে এর আদি-পোষকের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য ও খাদ্যাভ্যাসের আর একটি পোষক জীব বেছে নেয়। যেমন, আমাদের সাধারণ বড় কৃমি মানুষ, শূকর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিতে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। ক্ষুদে মাকড়সা, এককোষী 'ট্রাইকোমোনাস' পরজীবীগুলোর একাধিক পোষক বেছে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

বিবর্তনবিদেরা মনে করেন, পরজীবীর পোষক নির্দিষ্টতা দীর্ঘসময় ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় কার্যকরণের সূত্রেই উদ্ভব হয়েছে। তবে প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা শত সহস্র পরজীবী জীবের সুনির্দিষ্ট বিবর্তন শাখা নিরুপণ খুব সহজ ব্যাপার নয়। বরং তা যথেষ্ট জটিল বলেই মনে করা হয়।

Banglainternet.com